বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটোদের সেরা মাসিক পত্রিকা

৭১ বছর

শুকতারা

তৃতীয় সংখ্যা • এপ্রিল ২০১৮ ২০ টাকা

রূপকথা ও ফ্যান্টাসির

আশ্চর্য দুনিয়া

- সৈকত মুখোপাধ্যায়
- দীপান্বিতা রায়
- বিপুল মজুমদার
- সাগরিকা রায়
- সৌভিক চক্রবর্তী

বাঁটুল দি গ্রেট

নারায়ণ দেবনাথ

ফিরে দেখা

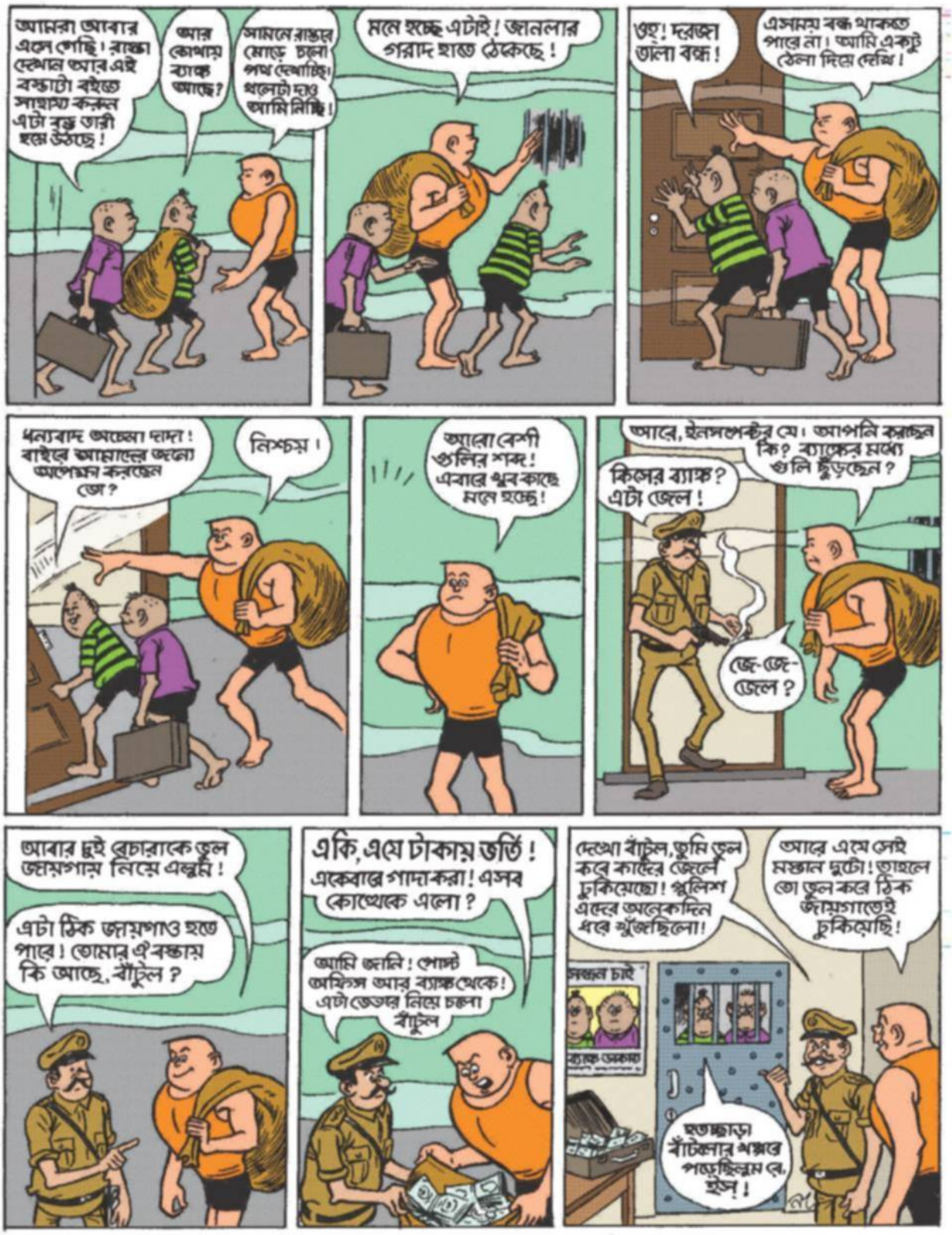

আমরা আবার এসে গেছি। রাস্তা দেখান আর এই বস্তাটা বইতে সাহায্য করুন এটা বড্ড ভারী হয়ে উঠছে!
আর কোথায় ব্যাঙ্ক আছে?
সামনে রাস্তার মোড়ে চলো পথ দেখাচ্ছি! থলেটা দাও আমি নিচ্ছি!
মনে হচ্ছে এটাই! জানলার গরাদ হাতে ঠেকেছে!
ওহ! দরজা তালা বন্ধ!
এসময় বন্ধ থাকতে পারে না। আমি একটু ঠেলা দিয়ে দেখি!
ধন্যবাদ অচেনা দাদা! বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তো?
নিশ্চয়।
আরো বেশী গুলির শব্দ! এবারে খুব কাছে মনে হচ্ছে!
আরে, ইনসপেক্টর যে। আপনি করছেন কি? ব্যাঙ্কের মধ্যে গুলি ছুঁড়ছেন?
কিসের ব্যাঙ্ক? এটা জেল!
জে-জে-জেল?
আবার দুই বেচারাকে ভুল জায়গায় নিয়ে এলুম!
এটা ঠিক জায়গাও হতে পারে! তোমার ঐ বস্তায় কি আছে, বাঁটুল?
একি, এযে টাকায় ভর্তি! একেবারে গাদা করা! এসব কোত্থেকে এলো?
আমি জানি! পোস্ট অফিস আর ব্যাঙ্ক থেকে! এটা ভেতরে নিয়ে চলো বাঁটুল
দেখো বাঁটুল, তুমি ভুল করে কাদের জেলে ঢুকিয়েছো! পুলিশ এদের অনেকদিন ধরে খুঁজছিলো!
আরে এযে সেই মস্তান দুটো! তাহলে তো ভুল করে ঠিক জায়গাতেই ঢুকিয়েছি!
সন্ধান চাই
ব্যাঙ্ক ডাকাত
হতচ্ছাড়া বাঁটকুলার পাল্লায় পড়েছিলুম রে, হুস!

সম্পাদকীয়

জীবনের পরতে পরতে জমে থাকে অভিজ্ঞতা, যেমন নদীর স্রোতে ভেসে আসা পলি ভিন্ন ভিন্ন ঢেউয়ের ছবি এঁকে দেয় পাড়ের বালুচরে। জীবনের স্তরের মতোই মানবসভ্যতার বুকেও ভিন্ন ভিন্ন যুগের ছবি আঁকা হয়ে থাকে। সেই ছবিগুলোকে আরো খানিকটা রঙ দিয়ে কল্পনার আকাশে উড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যায় রূপকথার গল্প।

এই কাহিনিগুলির চরিত্র সবই আমাদের চারপাশের জীবজগৎ এবং কল্পক্ষেত্র থেকে নেওয়া, সেখানে গরিব চাষি থেকে প্রজা, মন্ত্রী, দুষ্টু সুয়োরানি থেকে দুঃখী দুয়োরানি, উপকারী পরী থেকে ভয়ংকর রাক্ষসী—সবই উপস্থিত, কিন্তু উপস্থাপনা সহজ-সরল। পড়তে পড়তে ছোটদের সঙ্গে বড়রাও কল্পনার আকাশে পক্ষীরাজ ঘোড়া বা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর ডানায় ভর দিয়ে দিব্যি ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যায় ফ্যান্টাসির জগতে। কিন্তু রূপকথার গল্প হারিয়ে যায় না, জড়িয়ে থাকে আমাদের সঙ্গে, ছোটদের অক্সিজেন এবং বড়দের নস্ট্যালজিয়া হয়ে। রূপকথার গল্পের একটা বৈশিষ্ট্য হল, এতে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে উঁকি দেয় একত্বের ভাবনা। হয়তো চরিত্রের নাম পৃথক, কিন্তু কাহিনির বিশেষ পার্থক্য নেই। আবার কখনো দেখা যায় একই কাহিনি ভিন্ন দেশে পরিবেশিত হয়েছে ভিন্ন রূপে। আসলে আদিম মানুষের তো দেশ-বিদেশের প্রাচীর ছিল না, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, রূপকথার গল্পগুলিও একই ভাবে তার উৎপত্তিস্থল থেকে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর কোনায় কোনায় এবং সেই স্থানের জলবায়ু এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্তি ঘটিয়ে নিজেকে পাল্টে ফেলে। তাই ওদের পেগাসাস আর আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া কোথাও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির গল্প বা হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের আগলি ডাকলিং পাঠককে নিয়ে যায় এমন একটা দুনিয়ায় যেখান থেকে রূঢ় বাস্তব হয়তো অনেক দূরে কিন্তু ভবিষ্যতে সকলের অলক্ষে এবং অজান্তে কেমনভাবে যেন তাকে বেশ প্রাজ্ঞ করে তোলে! বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন আলোচনা সভায় বিতর্কের ঝড় ওঠে, রূপকথার গল্প ছোটদের আদৌ পড়া উচিত কিনা, কিংবা তাদের বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা, কিংবা কাটাছেঁড়া হয় এই গল্পগুলিতে কত শতাংশ রক্তপাত-হিংসা আছে আর কত শতাংশ মানবিক গুণ আছে...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি যুক্তি, তর্ক সরিয়ে রেখে নিজেকে প্রশ্ন করি স্বপ্নের জগতে রূপকথার দুনিয়ায় বেড়াতে কীরকম লাগে, তাহলেই সব তর্ক-বিতর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে। উত্তর বোধহয় সকলেরই এক হবে। গদ্যময় এই জগতে অল্পক্ষণের জন্য যদি ওই জগতে পাড়ি দিয়ে অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায়, ক্ষতি কী?

নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিও, আর অনেক অনেক বই পড়।

রূপা মজুমদার

আমরা দুঃখিত

শুকতারা-র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত *সত্রাজিৎ চাটার্জির 'অদ্ভুত রসিকতা'* শীর্ষক গল্পটি *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হরিশপুরের রসিকতা'* গল্প থেকে নকল করা। লেখকের এই অসততার জন্য আমরা তাঁকে ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমাদের পত্রিকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। *সম্পাদক*

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটোদের সেরা মাসিক পত্রিকা

শুকতারা

৭১ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৮

রূপকথা সংখ্যা

সম্পাদক

রূপা মজুমদার

(০৩৩) ২৩৬০ ১৬৫৫, ২৩৫০ ০২৭০

১৭, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

ফেসবুক পেজ

Nabokallol Suktara Debsahityakutir

মুদ্রক

বরুণচন্দ্র মজুমদার

এ. টি. দেব প্রাইভেট লিমিটেড

রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রকাশক

রাজর্ষি মজুমদার

দেব সাহিত্য কুটীর

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

(০৩৩) ২৩৫০ ৪২৯৪/৯৫/৭৮৮৭

Website : www.debsahityakutir.com

E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com

http://dhunt.in/Z3R9.

www.facebook.com/nabokallol/suktara/debsahityakutir

Online Payment

Allahabad Bank

61, M. G. Road, Kolkata-9, College Square Branch

A/c No. : 20808472955, IFS Code : ALLA0211713

State Bank of India

1B, Mahendra Sreemani Street, Kolkata-9

Amherst Street Branch

Current A/c No. : 10597067084

IFS Code : SBIN0001800

Branch Code : 01800 Amherst.

এখন যেকোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়

বার্ষিক মূল্য হাতে নিলে ২২৫ টাকা

বুকপোস্টে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ২৬০ টাকা

রেজিঃ ডাকে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ৪৬০ টাকা

Annual Subscription

UK and USA By Air Mail Rs. 2000

R.N.I. Registration No. 2621

শুকতারার সব ইলেকট্রনিক সংস্করণ স্বত্ব প্রকাশক দ্বারা সংরক্ষিত।

একমাত্র ডেইলিহান্ট মোবাইল অ্যাপ ছাড়া অন্য কোথাও ই-বুক রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ!!

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456(17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

মূল্য ঃ ২০ টাকা

গল্প

তুলোফুড়কি
—সৈকত মুখোপাধ্যায় ১০

মেঘের জাদুকর
—বিপুল মজুমদার ১৬

দুই নদীর গল্প
—মহুয়া মল্লিক ২৪

সোনার বিছে
—সাগরিকা রায় ৪২

সূর্যদেবের স্বয়ংবর
—দীপান্বিতা রায় ৫৪

পুরস্কৃত গল্প

নদী (প্রথম)
—সৌরীশ মিশ্র ৪৬

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় (দ্বিতীয়)
—মঞ্জুলা চক্রবর্তী ৪৮

করুণাময়ী (তৃতীয়)
—তপন কুমার বৈরাগ্য ৫০

ধারাবাহিক

বাঘার খাতার কয়েকটা পাতা
—ঋতা বসু ২০

স্বাধীনতার ৭০ বর্ষ পূর্তিতে শুকতারার নিবেদন

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত
—পীযূষকান্তি সরকার ২৫

ফিচার

রূপকথা ও ফ্যান্টাসির আশ্চর্য দুনিয়া
—সৌভিক চক্রবর্তী ৫৯

কুইজ কুইজ
—মানস ভাণ্ডারী ২৭

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা
—অগ্নি সান্যাল ৩৬

উঠছে যারা
—বীরু বসু ৪১

কবিতা ও ছড়া

নববর্ষে
—দেবাশিস্ বসু ৮

নতুন বছর
—আশিস গিরি ৮

বড় হলে কী যে হবি?
—রতনতনু ঘাটি ৮

নববর্ষ এল
—দীপঙ্কর গোস্বামী ৯

খোকন ভারি খুশি
—রাজীব মিত্র ৯

পুরস্কার
—সুব্রত ছাটুই ৯

বিভাগীয় লেখা

সম্পাদকীয় ৫
চিঠিপত্র ৫২
মজার পাতা ৩২
তোমাদের পাতা ৬৩
ছড়া-গড়ার আসর ২৬

ছবিতে গল্প

বাঁটুল দি গ্রেট
—নারায়ণ দেবনাথ ৩

হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ৬৫

ঘড়ি রহস্য—
গল্প ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
ছবি ও চিত্রনাট্য ঃ জুরান নাথ ২৮

লালটেম—
গল্প ঃ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ছবি ও চিত্রনাট্য ঃ অর্ক পৈতণ্ডী ৩৪

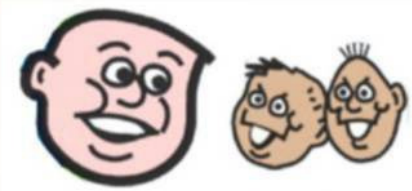

ঘোষণা

সোহিনী সরকার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫১

প্রচ্ছদ ■ রঞ্জন দত্ত
বিন্যাস ও কারিগরি সহায়তা
মেগাবাইট
১০, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

আগামী সে সংখ্যার আকর্ষণ

গল্পে আছেন
নন্দিতা বাগচী
চঞ্চল কুমার ঘোষ
মহুয়া দাশগুপ্ত
পল্লব বসু
তারক রেজ
ও
আরো অনেকে

রবীন্দ্র জন্মমাসে ৫০% বিশেষ ছাড়
অসাধারণ দুটো বই-এর জন্য

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

(নির্বাক যুগ থেকে সবাক চলচ্চিত্র পর্যন্ত
চলচ্চিত্রায়িত রচনাগুলির দুষ্প্রাপ্য তথ্য এবং মূল রচনাসহ এক মহাগ্রন্থ।
দুটি খণ্ড • প্রতি খণ্ড ৫০০ টাকা

ত্রিপুরার মহারাজা ধর্মমাণিক্যের সময়ে (১৪০৭-১৪৩৯)
'শ্রীরাজমালা'-র রচনা শুরু হয়।
দুষ্প্রাপ্য এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে ত্রিপুরা
রাজবংশের ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন সংস্কৃতির
মূল্য ৮০০ টাকা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পয়লা বৈশাখে আসছে

৩৫ বছর পর প্রকাশিত হচ্ছে
পরিমার্জিত এবং
পরিবর্ধিত রূপে
মূল্য
৫০০ টাকা

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত-র কলমে
রক্তে রাঙা দিন

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়
তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস এক মলাটে
মূল্য
১৬০ টাকা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য লেখনীতে বিভিন্ন স্বাদের রচনা

সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও
স্বামী বিবেকানন্দ মূল্য ১২০ টাকা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
শুকতারার সেরা গল্প মূল্য ১০০ টাকা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অমনিবাস (১ম খণ্ড) মূল্য ৪০০ টাকা

জনপ্রিয় লেখকের জমজমাট ৪টি বই
কিশোর কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য গল্প সমগ্র মূল্য ৩০০ টাকা
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শুকতারার সেরা গল্প মূল্য ৮০ টাকা
সেকালের ভূত! একালের ভূত! (সম্পাদিত) মূল্য ২২৫ টাকা
মানুষ থাকলে ভূতও থাকে (সম্পাদিত) মূল্য ২২৫ টাকা

১লা এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিটি বইয়ের ওপর ৩০% ছাড়

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
দূরভাষ - (০৩৩) ২৩৫০ ৪২৯৪/৯৫/৭৮৮৭
E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com • Website : www.debsahityakutir.com

নতুন বছর

আশিস রি

চৈত্র শেষে াজন মানেই
আমার বাংলাদেশ
সবকিছুকে অতীত করে
বছর হল শেষ।
আম-কাঁঠালের গন্ধ মেখে
বৈশাখের এই দিনে
নতুন বছর মাতল সুরে
নতুন সময় চিনে।
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা আমার দেশ
বাংলা বিভোর স্বপ্ন অ ার
বাংলা যে অশেষ।
বৈশাখের এই নতুন বছর
প্রাণ জুড়োনো মেলা
আকাশে আজ ভাসিয়ে দেবো
বাংলাভাষার ভেলা।
নতুন বছর নতুন দিনে
শুদ্ধ মনেপ্রাণে
ভরিয়ে দেবো দিক-দ্বি ন্ত
শুধুই বাংলা গানে।

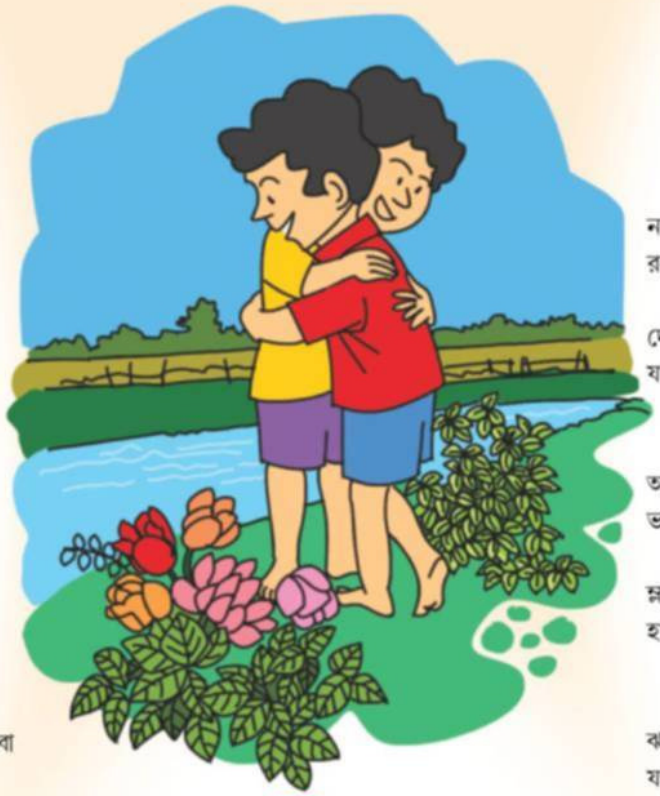

নববর্ষে

দেবাশিস্ বসু

নববর্ষে
রব হর্ষে
এটাই তো শুধু প্রার্থনা
দেশ থেকে দ্বেষ
যাক হয়ে শেষ
হিংসা-বিবাদ আর তো না।

আলো আশা আঁকা
ভালোবাসা মাখা
নতুনদিনের নিঃশ্বাসে
ম্লান যত মুখে
হাসি ঝরে সুখে
রোদ্দুর-সোনা বিশ্বাসে।

ঝরে হিমগুঁড়ি
যত ফুলকুঁড়ি
ফুটবে আলোর স্পর্শেতে
সব ভালো থাক
দুঃখেরা যাক
খুশি-খুশি নববর্ষেতে।

বড় হলে কী যে হবি?

রতনতনু াটী

া-হাত-পা ব্যথা, জ্বর এসেছে কি? জানতে চাইছ ঠামি?
কাল সারারাত ছায়ার সঙ্গে কুস্তি লড়েছি আমি।

মা তুমি ভাবছ আমার দু'চোখ কেন হল এত লাল?
ছবির নদীতে সারাটা দুপুর সাঁতার কেটেছি কাল।

বাবা ভেবো না তো আঙুল কী করে ফুলে হল টোপা কুল?
মে র সেলেটে অঙ্ক করেছি মুছে ছে বিলকুল!

দাদা ভাবছিস উদাসীন কেন মন কি য়েছে চুরি?
কল্প-ক্রিকেটে আজই করেছি চারখানা সেঞ্চুরি।

দিদির ভাবনা শরীরটা কেন কালশিটে হয়ে আছে?
পঞ্চাশবার উঠেছি-নেমেছি, ল্পের তাল াছে।

দাদু তুমি এত ভেবো না তো আজ হাঁটুখানা কেন ফোলা?
স্বপ্নে একাই সাতখানা াল দিয়েছে তোমার ভোলা।

তোমরা সকলে বলছ এখন, 'বড় হলে কী যে হবি?'
তোমাদের বলি, সবটাই হল অচেনা ভূতুড়ে ছবি!

পুরস্কার

সুব্রত ছাটুই

যে দেশেতে আমি যাই
সেটাই আমার দেশ,
আকাশ তলে বনবীথিকায়
সকল পথের শেষ।

যে দেশেতে আমি যাই
সেথায় আমার ঘর,
নেই ভেদাভেদ কারুর সাথে
নয়কো কেউ পর।

পৃথিবীটা একটা দেশ
এমন হত যদি
আমার চোখে সব স্বপ্ন
লুকিয়ে দেখতো নদী।

নববর্ষ এল

দীপঙ্কর গোস্বামী

সময় গাছের চৈত্র ফুলটি
টুকুস করে ঝরতে—
বৈশাখী ফুল উঠল ফুটে
নতুন বছর পড়তে।

আমের মুকুল ঘ্রাণ ছড়াল
বকুল দিল উঁকি,
বর্ষবরণ উৎসবেতে
মাতল খোকাখুকি।

গাইল পাখি, হাসল আকাশ,
চলল নদী ছুটে—
ভোরের প্রথম নবীন আলোয়
আঁধার গেল টুটে।

বলল বাতাস পয়লা দিনে—
মনের ময়লা ঝেড়ে,
ওঠ্ রে তোরা শুদ্ধ মনে
আগামীতে বেড়ে।

লক্ষ তারা স্বপ্ন নিয়ে
করল চোখে স্পর্শ,
হৃদয় জুড়ে তুফান তুলে
নাচল নববর্ষ!

খোকন ভারি খুশি

রাজীব মিত্র

খোকন সোনার মাথায়—
দুম করে যেই চিন্তা এল
এঁকে ফেললো খাতায়।

আঁকলো ছোট পুষি,
পুষি হঠাৎ করলো মিঁয়াও
খোকন শুনে খুশি।

এবার খোকন ভাবে,
পুষির গায়ে রঙ লাগালে
বাঘ কি দেখা যাবে?

দেখতে খোকন বাঘ—
পুষির গায়ে চাপিয়ে দিল
হলুদ কালো দাগ।

ফলটা হাতে নাতে—
সেই পুষি, বাঘ হয়ে হালুম
করলো সাথে সাথে।

খোকন পেল ভয়!
বাঘ বললে, আমায় নিয়ে
ঠাট্টা তো আর নয়!

খোকন কী আর করে?
বাঘের গায়ে আবার সাদা
রঙের আঁচড় পড়ে।

বাঘটা আবার পুষি,
মিঁয়াও করে ডেকে উঠতেই
খোকন ভারি খুশি।

ছবি : রাজীব মিত্র

গল্প

তুলাকুরকি

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ছবি : রঞ্জন দত্ত

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বেলা একটু বাড়লেই মাথার চাঁদিতে রোদের ঝাঁজ দিব্যি টের পাওয়া যায়। এইরকম একটা সময়েই মা-মৌটুসিপাখি রাঙাপাহাড়ের মাঠের ধারে একটা হিজলগাছের ডালে বাসা বাঁধল।

বাসা বাঁধলেই কাজ শেষ হয় না; বরং তার পরেই আসল কাজ শুরু হয়। ছোট্ট পাখিটা এবার সেই বাসার মধ্যে বসে ডিমে তা দিতে শুরু করল। তা দেওয়ার সময় আবার ডিম ফেলে নড়াচড়া করা বারণ। মা-মৌটুসি তাই ডিমে তা দিতে-দিতে কখনো একটু ঝিমোয়, কখনো লম্বা ঠোঁট দিয়ে ডানার পালকগুলো আঁচড়ে নেয় আর বেশিরভাগ সময়েই বাসার দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দ্যাখে, চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে। ওদিকে তার বুকের নীচে, পালকের গরমে, ছোট-ছোট ডিমগুলোর মধ্যে ছানারা বড় হতে থাকে।

এইভাবেই দশটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। এগারোদিনের দিন বিকেলের দিকে করমচার মতন খুদিখুদি দুটো ডিমের খোলস চিরচির করে ফেটে গেল আর ডিমের ভেতর থেকে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেরিয়ে এল ছোট্ট দুটো ছানা। তাদের গা ভর্তি সাদা সাদা রোঁয়া, ন্যাড়া মাথা আর গোল গোল কালো কালো চোখ।

ডিম ফুটে বেরিয়েই ছানাদুটো খাই-খাই করে এমন চিৎকার জুড়ল যে, মা-পাখির মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তক্ষুনি তাকে বাসা ছেড়ে ছুটতে হল মধুর খোঁজে।

লম্বা ঠোঁট ভর্তি করে ফুলের মধু নিয়ে যখন মা-মৌটুসি আবার বাসায় ফিরল, ততক্ষণে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দুটো বাচ্চাকে পেট ভরে মধু খাইয়ে, চাপড়ে-চুপড়ে ঘুম পাড়িয়ে যখন মা-মৌটুসি নিজেও একটু ঘুমোবার উদ্যোগ নিচ্ছে, তখনই হঠাৎ তার চোখে পড়ল—এই রে! একটা ছানা যে বাসা থেকে হিজলগাছের তলায় পড়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সেই পড়ে-যাওয়া ছানাটাকে ঠোঁটে করে বাসায় তুলে আনল। তারপর সেই ছানাটার মুখেও একটু মধু ঢেলে দিয়ে মৌটুসি-মা তার তিনটে ছানাকেই ডানার নীচে চেপেচুপে সেই রাতের মতন ঘুমিয়ে পড়ল।

মৌটুসি-মা যদি অঙ্ক জানত তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারত যে, গাছের নীচ থেকে যেটাকে তুলে আনল, সেটা ওর নিজের ছানা নয়। দুটো ডিম থেকে দুটো ছানাই হয় আর সেই দুটো ছানা তো বাসাতেই ছিল। কিন্তু পাখিরা গানে আর ভূগোলে খুব ভালো হলেও অঙ্ক একটুও জানে না। তাই সেই মৌটুসিটাও ভুল করে নিজের দুটো ছানার ওপরে আরেকটা তিন-নম্বর ছানাকে বড় করে তুলতে লাগল।

না, একটু ভুল বললাম। অন্য ছানাদুটো বেশ চটপট বড় হয়ে উঠলেও ওই কুড়িয়ে আনা ছানাটা একটুও বেড়ে উঠছিল না। সে সেই প্রথমদিনে যতটুকুন ছিল, এক সপ্তাহ বাদেও ততটুকুনই রয়ে গেল।

কেমন করে বাড়বে বলো। সে তো আর সত্যিকারেই মৌটুসির ছানা ছিল না। সে ছিল একটা তুলোর টুকরো।

তুলো কোথা থেকে এল জিগ্যেস করছ? কেন, রাঙাপাহাড়ের মাঠে প্রতিবছরই তো বসন্তের শেষে অমন কত রাশিরাশি তুলোর টুকরো হাওয়ায় উড়ে যায়। ওরা সব শিমুলতুলো। পাহাড়তলির বনে রয়েছে অনেক শিমুলগাছ। সারা ফাগুনমাস টকটকে লাল ফুলের বাহারে তাদের ডালপালা দেখা যায় না। চৈত্রমাসের শুরুতেই ফুল থেকে ফল হয় আর চৈত্রের শেষে সেই ফলগুলো যখন ফটফট করে ফেটে যায় তখন ফলের ভেতর থেকে অজস্র হালকা তুলো বেরিয়ে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে যায় দূরদূরান্তে।

সেইরকমই একটা তুলোর টুকরো ছিল ওই মৌটুসিপাখির তিননম্বর ছানাটা। ফলের পেট থেকে তার বেরোতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। অন্য শিমুলতুলোরা ততদিনে অনেক দূরে-দূরে চলে গেছে।

আসলে হয়েছিল কী, যে-গাছটায় ওই শিমুলতুলো জন্মেছিল, সেই গাছটাতে যে কোনোদিন ফুল আসবে, ফল ধরবে, তা-ই কেউ ভাবেনি।

কেন বলো তো?

গাছটা জন্মেছিল ভারী বেখাপ্পা জায়গায়। পাহাড়তলির বন ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওপরে একটা পাথুরে জমিতে জন্মেছিল সেই রোগাপাতলা গাছটা। সেখানে জল নেই, নরম মাটি নেই। তাহলে গাছ বাড়বে কেমন করে আর কেমন করেই বা তাতে ফল-ফুলের আশা করবে?

অবাক কাণ্ড। অনেকগুলো বসন্তকাল শূন্য ডালপালা নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার পর, সেই-বছরেই রোগা গাছটায় ফুল এল—একটা মাত্র ফুল। শিমুলগাছটা পাথুরে-মাটির অনেক গভীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল তুলে তার একমাত্র ফুলটার ঠোঁটে ঢেলে দিত। বলত, আহা, বেঁচে থাক বাছা আমার।

তারপর সেই একটা ফুল থেকে একটাই মাত্র ফল হল। বনের অন্যান্য সমস্ত গাছের সমস্ত ফল পেকে ফেটে গেল। এই ফলটা আর পাকে না।

অবশেষে একদিন ফল ফাটল। দেখা গেল তার বুকে একটা মাত্র তুলোর টুকরোর মধ্যে গুড়িগুড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে একটা মাত্র বীজ।

যেদিন ফলের মুঠি আলগা করে সেই একলা বীজ তার তুলোর ডানা নিয়ে বাতাসে ভাসল, সেদিনটা মোটেই তুলো ওড়ার দিন ছিল না। তখন বনে আর কোকিলের গান নেই। কচিপাতারা ততদিনে আবার ধুলো মেখে ধূসর হয়ে গেছে। বনের ভেতরে তখনো একটু দখিনা হাওয়া বইছিল ঠিকই, কিন্তু বন ছেড়ে বেরিয়ে মাঠের মাঝামাঝি অবধি এসেই সেই হাওয়ার হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। সে বলল, এই রে, বৈশাখমাস তো পড়ে গেছে। আমার ছুটি তো শেষ। যাই বাবা, আবার বনের ভেতরে লুকিয়ে পড়ি, না হলে ঋতুরাজের কাছে খুব বকুনি খাব। এই বলে চট করে তুলোর টুকরোটাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে সেই হাওয়া আবার বনে ফিরে গেল আর বুকের মধ্যে বীজ নিয়ে সেই তুলোর টুকরোটা মনমরা হয়ে পড়ে রইল একটা হিজলগাছের নীচে। হ্যাঁ, এটাই সেই গাছটা, যেটার ডালে মৌটুসিপাখি বাসা বেঁধেছিল।

তারপর যে কী হয়েছিল সে তো তোমাদের আগেই বলেছি।

একমাসের মাথায় মৌটুসি-মা ঘটাপটা করে তিন ছানার মুখেমধু অনুষ্ঠান করল। মৌটুসিদের ঘরে সেরকমই নিয়ম। এই অনুষ্ঠানের পরেই বাচ্চারা বাসা থেকে বেরিয়ে নিজেদের মতন ফুলে-ফুলে ঘুরে বেড়াতে পারবে। ইতিমধ্যে বাবা মৌটুসিও ফিরে এসেছিল। মা-পাখি তাকে বলল, কীগো? বাচ্চাদের নামটাম দাও। সারাজীবন ওদের এক-নম্বর, দু-নম্বর, তিন-নম্বর বলেই ডাকব নাকি?

বাবা পাখি তখন এক-নম্বর ছানার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরে বলল, এটা আমার মেয়ে দেখছি। খুব মিষ্টি হয়েছে মুখটা। এর নাম দিলাম গুড়মুড়কি।

দু-নম্বর ছানাটা বোনের আদর দেখে হিংসেয় তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছিল। বাবা-পাখি বলল, আর এইটা ব্যাটাছেলে। কিরকম তুড়িলাফ মারছে দেখেছ? এর নাম দিলাম নাচনতুর্কি।

তিন-নম্বর ছানাটা চুপ করে বাসার এক কোনায় বসেছিল। বাবা-পাখি তাকে দু-ডানায় জড়িয়ে নিয়ে বলল, এই মেয়েটা বড্ড হালকা আর কমজোরি। বড্ড শান্ত। গায়ের পালকগুলোও এখনো ওদের মতন রঙিন হল না, সেই সাদাই রয়ে গেল। যেন তুলোর মতন ফুরফুরে। এর নাম দিলাম তুলোফুড়কি।

তারপর গুড়মুড়কি, নাচনতুর্কি আর তুলোফুড়কিকে ওদের বাবা-মা বাসার দরজা থেকে উড়িয়ে দিল। বলল, যাও বাছারা। প্রকৃতি-মায়ের দুনিয়ায় নিজেদের ডানা আর ঠোঁটের জোরে বেঁচে থাকো। রোদ বৃষ্টি বাতাসের কথা শুনো। মাটি আর গাছের ইশারা মেনো। ভুলেও কক্ষনো ওদের বিরুদ্ধে যাবে না। দেখবে তাহলেই আর কোনো অসুবিধে হবে না।

গুড়মুড়কি আর নাচনতুর্কি সঙ্গে সঙ্গেই 'পিকোলো পিকোলো পিইইক' বলে খুশির আওয়াজ ছেড়ে, হাওয়ায় ডিগবাজি খেতে খেতে উড়ে গেল পাহাড়তলির বনের দিকে। থামল গিয়ে একেবারে একটা ফুলে ভরা কলকেগাছের ডগায়। তারপর মনের আনন্দে কলকেফুলের সোনার সানাইয়ের মতন পাপড়ির ভেতরে লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে মধু খেতে শুরু করল।

তুলোফুড়কিও তার ভাই আর বোনের পেছনে পেছনে সেই কলকেগাছ অবধি এসেছিল। তবে তার একটু দেরি হয়েছিল।

কী করবে? সে তো আর সত্যিকারের পাখি নয়। তার তো আর ডানা নেই। তাই তাকে ভেসে পড়ার জন্যে একটা সুবিধেমতন হাওয়ার পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। বৈশাখমাসে রাঙাপাহাড়ের মাঠে সেরকম হাওয়া মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে যায় ঠিকই। দখিনাহাওয়ার মতন জোরালো আর একটানা নয় সে হাওয়া। সে হল গরম হাওয়ার ছোট-ছোট ঘূর্ণিপাক। সেরকমই একটা ঘূর্ণিহাওয়ার কোলে চেপে তুলোফুড়কি কোনোরকমে কলকেগাছ অবধি পৌঁছল। তারপর যাতে আবার উড়ে না যায় সেই ভয়ে একটা সরু ডাল জড়িয়ে ধরে গুটিশুটি মেরে বসে রইল।

একটু বাদেই বনের অন্য সব পাখি, প্রজাপতি আর কাঠবেড়ালির মতন ছোট প্রাণীরা ওদের সঙ্গে আলাপ করতে এল। বনের দেশে বন্ধুত্ব হতে দু-মিনিট লাগে। গুড়মুড়কি আর নাচনতুর্কির সঙ্গে ওদের খুব তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে গেল। কিন্তু তুলোফুড়কির দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়েই আর কেউ ওর কাছে ঘেঁষল না। খেলতেও ডাকল না।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মৌটুসির আসল দুটো ছানা সবার সঙ্গে মিলেমিশে ঝরনার পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে কুমিরছানার সঙ্গে কুমিরডাঙা খেলছে। সোনালি মাছিদের সঙ্গে কানামাছি খেলছে। নদীর ধারে সবুজ মাঠে গোল হয়ে বসে, জারুলফুলের রুমাল দিয়ে রুমালচোর খেলছে।

ওরা লুকোচুরিও খেলতে শুরু করেছিল। কিন্তু গিরগিটির বাচ্চাটা প্রত্যেক দানেই গাছপালার সঙ্গে রং মিলিয়ে এমন লুকিয়ে পড়ছিল যে, ওকে কেউ হারাতে পারছিল না। তাই ধুত্তোর বলে লুকোচুরি খেলা ছেড়ে দিয়ে ওরা গঙ্গাফড়িংদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলতে শুরু করে দিল।

সারাদিন খেলেটেলে ক্লান্ত হয়ে গুড়মুড়কি আর নাচনতুর্কি সন্ধেবেলায় আবার সেই কলকেফুলের গাছেই ফিরে এল। ফিরে এসে দ্যাখে, তুলোফুড়কি এতখানি ঠোঁট ফুলিয়ে, ছলোছলো চোখে, গোঁজ হয়ে বসে আছে। ওদের দেখেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। ওরা দুজন অপরাধীর মতন মুখ করে বলল, কী হল তুলোফুড়কি? কাঁদছিস কেন?

কাঁদব না? চোখ মুছতে-মুছতে কোনোরকমে উত্তর দিল তুলোফুড়কি। তোরা যে সারাদিন এত খেলে এলি, আমার কথা একবারও মনে পড়ল না?

গুড়মুড়কি তুলোফুড়কিকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাঁদিস না বোন আমার। জানিস তো চোখের জল গায়ে লাগলেই তুই কেমন ন্যাতপেতে হয়ে যাস। তখন আবার তোকে রোদে শুকোতে হবে। দ্যাখ, আমাদের কী দোষ বল। তুই-ই তো উড়তে পারিস না, খালি ভাসতে পারিস। কিচিরমিচির করে ডাকতে পারিস না, শুধু মনেমনে কথা বলিস—যে- কথা মা, বাবা, নাচনতুর্কি আর আমি ছাড়া কেউ শুনতে পায় না। কেমন করে অন্যদের সঙ্গে খেলবি বল। তাছাড়া...আমি তোকে একবার ডাকতেও যাচ্ছিলাম। কিন্তু...

গুড়মুড়কি কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। নাচনতুর্কির বোধশোধ কম। ও ফটাস করে বলেই দিল সেই কথাটা। বলল, দ্যাখ তুলোফুড়কি, তোর বুকের ভেতর ওই যে কালো হৃদপিণ্ডটা। কী বিচ্ছিরি। ওটা দেখে কাঠবেড়ালি, প্রজাপতি ওরা ঘেন্না পাচ্ছিল। ওরা তোকে খেলায় নিতে চাইছিল না।

তুলোফুড়কি তারপর আর একটাও কথা বলল না। ওর প্রথমে খুব অভিমান হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে ওর মনে হল, গুড়মুড়কি আর নাচনতুর্কির প্রতিটি কথাই তো সত্যি। সত্যিই তো সে অন্য পাখিদের মতন উড়তে পারে না। সত্যিই তো সে কথা বলতে পারে না, ডাকতে পারে না। সত্যিই তো তার বুকের ভেতরে কালো রঙের শক্ত একটা দানা রয়েছে, যেটাকে বাইরে থেকেও দ্যাখা যায়—যেরকম বিচ্ছিরি হৃদপিণ্ড আর কোনো জন্তুর নেই।

সবই তো সত্যি।

তাহলে কি সে এইভাবে এক জায়গায় জবুথবু হয়ে বসে একা-একাই জীবন কাটাবে? সেকি আর কোনোদিন পাখির মতন পাখি হতে পারবে না?

তুলোফুড়কি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—গুড়মুড়কি আর নাচনতুর্কি সারাদিনের পরিশ্রমে এরমধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা। সারারাতের এই ঘুম ওদের নতুন শক্তি দেবে। ভোর হতে না হতেই ওরা আবার গান গাইতে-গাইতে হাওয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভোমরাদের সঙ্গে ঝগড়া করে খেয়ে আসবে আকন্দ আর বাসকফুলের মধু। সবার সঙ্গে ভাব করে খেলতে যাবে নদীর চরে।

শুধু তুলোফুড়কির খাবার জোগাড়ের চিন্তা নেই, তাই উড়ে বেড়ানোর পরিশ্রমও নেই। আর পরিশ্রম নেই বলে ঘুমও নেই তার চোখে।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঘুমহারা দু-চোখ মেলে তুলোফুড়কি দেখে, আকাশ ভরা তারার মালা। একফালি চাঁদ আস্তে আস্তে পশ্চিম থেকে পুবের অস্তগিরির দিকে এগিয়ে চলে। ঠান্ডা হাওয়া বয়। কাকের ডানার মতন কালো-আকাশে হঠাৎ হঠাৎ এক-দুটো রুপোলি উল্কা ধনুকের মতন বাঁক খেয়ে একদিক থেকে আরেকদিকে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সেরকমই একটা উল্কা মিলিয়ে না গিয়ে কলকেগাছের ঠিক ওপরের আকাশটায় থমকে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে নেমে এল ঠিক সেই ডালটায়, যে-ডালটার ওপরে তুলোফুড়কি বসেছিল।

তুলোফুড়কি জানত, জেগে জেগে কেউ স্বপ্ন দ্যাখে না। আর সে তো ঘুমোচ্ছে না বটেই। তবু এটা সে কী দেখছে? ভালো করে চোখদুটো কচলে নিয়ে, তুলোফুড়কি আবার আড়চোখে তাকাল তার ডানপাশে, যেখানে ছোট্ট রুপোলি আলোটা এসে স্থির হয়েছিল।

তুলোফুড়কি দেখল, এখন সেই রুপোলি আলোটা আর আলো নেই। হয়ে গেছে ছোট্ট একটা মেয়ে।

তুলোফুড়কি আমতা-আমতা করে বলল, ইয়ে...তুমিই কি একটু আগে আকাশ থেকে উল্কার মতন খসে পড়লে?

মেয়েটা ফোঁস করে উঠল, ছিঃ। খসে পড়ব কেন? উড়ে এলাম দেখতে পেলে না?

তুলোফুড়কি একটা ঢোক গিলল। এসব কী বলছে রে বাবা মেয়েটা! মানুষেরা আবার উড়তে পারে নাকি? তুলোফুড়কি আবার ভালো করে মেয়েটার মাথা থেকে পা অবধি দেখল।

মেয়েটা যে অপূর্ব সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই। শিশিরজলে-ধোয়া পদ্মপাতার মতন চিকন শ্যামল তার গায়ের রং, পানপাতার মতন মুখ, ভুট্টার দানার মতন সাজানো দাঁতের সারি আর পিঠের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একরাশ

এলোমেলো চুল। মেয়েটা তুলোফুড়কির দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসছিল আর সেইসঙ্গে তার বেতফলের মতন কুচকুচে কালো চোখের মণি দুটোও হাসছিল। সব মিলিয়ে তুলোফুড়কির মোটেই তাকে পাগল বলে মনে হল না। তাই সে মেয়েটাকে বলল, দ্যাখো, কিছু মনে কোরো না। আমার বয়স তো বেশি নয়, তাই এখনো পৃথিবীর সবকিছু শিখে উঠতে পারিনি। বলো তো, সব মানুষই কি উড়তে পারে?

মেয়েটা কষ্টি-পেয়ারার মতন মিষ্টি থুতনিটা ওপরদিকে তুলে জবাব দিল, কোনো মানুষই পারে না। কিন্তু পরিরা পারে। আমি উড়তে পারি, কারণ আমি একজন পরি। এই বলে মেয়েটা তুলোফুড়কির দিকে একবার পিঠটা ফেরাল আর তুলোফুড়কি দেখল, ও মা! সত্যিই যে ওর পিঠে ফড়িং-এর ডানার মতন ফিনফিনে স্বচ্ছ দুটো ডানা।

কিন্তু ওর ডানাদুটো অত ছেঁড়াখোঁড়া কেন? ওর পিঠে, হাতে সর্বত্র অত কাটাকুটির দাগ কেন? কেনই বা ওকে দেখে মনে হচ্ছে, কতদিন যেন চান করেনি?

তুলোফুড়কি আমতা আমতা করে জিগ্যেস করল, পরি, তোমার গায়ে গয়না কই? মাথায় মুকুট কই? তোমার হাতের জাদুদণ্ড কই? তোমার রেশমের পোশাক ছিঁড়ে গেছে কেন? কেনই বা তোমার হাতে-পায়ে এত ছড়ে যাওয়ার দাগ?

পরি কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে বসে রইল। তুলোফুড়কি দেখল পরির দুচোখের কোনা থেকে দুটো জলের ফোঁটা গাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করেছে। হঠাৎ সেই ছোট্ট পরি হাতের উলটোপিঠ দিয়ে জলের ফোঁটাদুটো মুছে নিয়ে হেসে উঠল। বলল, আমি এইরকমই গো। অন্য পরিদের মতন নই। জলপরির মতন আমার পদ্মকুড়ির নৌকো নেই। ফুলপরির মতন প্রজাপতিতে টানা রথ নেই। আমি জর্দাপরির মতন রঙিন জরির শাড়ি পরতে পারি না, কনকপরির মতন সোনার গয়নায় সাজতে পারি না।

কাঁটাগাছের বনে থাকি। আমি ক্যাকটাস-পরি।

ক্যাকটাসগাছের ধারাল কাঁটার খোঁচায় প্রতিদিন আমার চামড়া ছড়ে যায়, ডানা ছিঁড়ে যায়। আমার পোশাক-আশাক ফালাফালা হয়ে যায়। আমি যেখানে থাকি সেখানে জল পাওয়া যায় না, তাই আমি অনেকদিন চান করতে পারিনি। সারাদিন সেখানে গরম হাওয়ার সঙ্গে বালি ওড়ে। দ্যাখো, আমার চুলভর্তি কত ধুলো আর বালি।

তারপর সেই ক্যাকটাস বনের পরি তুলোফুড়কির পাশে বসে তাকে শোনাল এক আশ্চর্য দেশের গল্প।

সেই দেশটাও এককালে এই পাহাড়তলির বনের মতন গাছপালায় ভর্তি ছিল। গাছেদের ডাকে আকাশের মেঘেরা সেখানেও বৃষ্টি ঝরিয়ে যেত। সেই বৃষ্টির জল কিছুটা গাছেরা পান করত, কিছুটা দিয়ে বনের জীবজন্তু স্নান করত। কিছুটা জল সেই দেশের পুকুর, নদী আর ঝর্নার বুক ভরিয়ে দিত আর বাকিটা জমা থাকত মাটির নীচে। গরমের দিনে গাছপালার শেকড় সেই মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা জলের বুকে ঠোঁট ডোবাত আর জীবজন্তু মুখ ডোবাত পুকুর, নদী আর ঝর্নার জলে।

ওই বনেই থাকত এই ছোট্ট পরির দাদু-দিদা, তাদেরও দাদু-দিদা আর তাদেরও দাদু-দিদা। মানে, অনেক-অনেক যুগ ধরে

তারা একটার পর একটা গাছ কাটতে শুরু করল

পরিদের বাস ছিল সেই বনে। আসলে বন ছাড়া অন্য কোথাও যেমন পরিরা বাঁচতে পারে না, তেমনই পরিদের বাদ দিয়ে আবার কোনো বনই থাকতে পারে না।

পরিরা না থাকলে কারা মাকড়সার জালের ফিনফিনে সুতোর গায়ে ভোররাত্তিরের হিমের ফোঁটাগুলোকে যত্ন করে সাজিয়ে দেবে? সদ্য গুটি ভেঙে বেরিয়ে আসা প্রজাপতির খিল-লাগা ডানাদুটোকে দলাই-মলাই করে সোজা করবে কারা? কারাই বা আলেয়ার বাতি দেখিয়ে রাতের আকাশে উড়ে চলা হাঁসেদের বলবে, আবে আবে। এইখানেই তো শালুকফুলের বিল, যেখানে প্রত্যেক বছর তোমরা শীত কাটাও। পথ ভুলে চললে কোথায়?

এসব সূক্ষ্ম কাজ যে মানুষের মোটা-মোটা আঙুলে হয় না, সে-কথা সবাই জানে।

তো, সেই বনে অনেক বছর ধরে পরিরা সুখেই ছিল। তারপর একদিন সেখানে দলে-দলে মানুষ এল। তারা কাঠুরে। তারা একটার পর একটা গাছ কাটতে শুরু করল। ওইসব কাঠ দিয়ে নাকি শহরের বাড়িঘর, আসবাবপত্র তৈরি হবে।

কাঠুরেরা একটা-একটা করে গাছ কাটে আর সেই গাছের ডালে-ডালে যত পাখির বাসা, কোটরে-কোটরে যত কাঠবেড়ালির সংসার এমনকি বাকলের নীচে যত পোকামাকড়ের ঘর—সব তছনছ হয়ে যায়।

সেসব তো তবু মানুষ দেখতে পায়। যেটা দেখতে পায় না সেটা হল, প্রতিটি গাছে কুড়ুলের প্রথম কোপটা পড়ামাত্রই সেই গাছের পরিরা উড়ে চলে যায় অন্য দেশে।

এইভাবে গাছ কাটতে কাটতে শেষ অবধি একটামাত্র গাছ বেঁচে রইল। একটা মস্ত বড় মহুয়াগাছ। কাঠুরেরা নিজেদের থাকার তাঁবুগুলো খাটিয়েছিল ওই বিরাট মহুয়াগাছটার ছায়ায়। সেইজন্যে ওই গাছটাকে ওরা কাটেনি।

তুলোফুড়কির সঙ্গে যে ক্যাকটাস-পরি গল্প করছে, সে জন্ম থেকে ওই গাছটাতেই বাস করত।

অন্য সব গাছ যখন কাটা হয়ে গেল—এককালের অত সুন্দর সবুজ বনটা যখন হয়ে গেল তেপান্তরের মাঠের মতন শূন্য—তখন এই ছোট্ট পরিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার জাদুদণ্ড, তারার বিন্দি, চাঁদের আলোর ওড়না সবকিছু একটা ঝিনুকের খোলের মধ্যে গুছিয়ে নিল। কিন্তু তারপর মহুয়াগাছের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল। কিছুতেই আর সে মহুয়াগাছকে মুখ ফুটে বলতে পারছিল না, মহুয়াদিদি, এবার আমি যাই?

মহুয়াগাছ পরির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বোকা মেয়ে। আমাকে কাঠুরেরা কেটে ফেলবে বলে কাঁদছিস? খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, আমার বীজ থেকে এদিকে-সেদিকে কত মহুয়াগাছ জন্ম নিয়েছে। আমার প্রাণটা তাদের সবার মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। আমি কি মরতে পারি? কাঁদিস না। কিন্তু একটা কথা তোকে বলি মেয়ে। আমাকে কেটে ফেললেও তুই আর কটা দিন এখানে থেকে যাস।

পরি অবাক হয়ে বলল, কেন মহুয়াদিদি? কেন থাকব? কোথায়ই বা থাকব?

মহুয়াগাছ পরির কথার উত্তরে শুধু বলতে পারল, ওদের যে তোকে প্রয়োজন হবে।

ওরা কারা, কেনই বা প্রয়োজন হবে, এসব কিছুই আর বলতে পারল না সেই মহুয়াগাছ। কারণ, আর কিছু বলার আগেই তার গুঁড়িতে কুঠারের ঘা পড়ল ঠকাস ঠকাস। আর মড়মড় করে কেঁপে উঠল তার সমস্ত শরীর। পরি সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে গেল আকাশে।

চলেই যাচ্ছিল সে তার প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে। কিন্তু হঠাৎ যেন মাটির কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে কারা ডেকে উঠল, পরিইই! ছোট্ট পরিইইই! আমাদের ফেলে তুমি চলে যেও না। আমরা তাহলে বাঁচব কেমন করে?

পরি দেখল তার পায়ের নীচে শুধুই পাথুরে জমি। বন ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মেঘেরাও সেই দেশ থেকে রাগ করে চলে গেছে। বৃষ্টি হয় না বলে মাটি হয়ে গেছে পাথর। মাটির নীচের জল, ঝর্নার জল, পুকুরের জল সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। তাহলে ওখান থেকে গাছের গলায় ডাকে কারা?

পরি ডানা মুড়ে মাটিতে নেমে এল। অবাক হয়ে দেখল, এই কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে অনেকগুলো কাঁটাগাছ গজিয়ে উঠেছে। এই বনে আগে কখনো কাঁটাগাছ ছিল না। এখন শুধু ওরাই রয়েছে।

পরিকে কাছে পেয়ে ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, পরি, দেখতে বাজে বলে কি আমরা গাছ নই? আমাদের কি প্রাণ নেই? তাহলে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে কেন?

পরি বলল, আমি থাকলেই বা তোমাদের কোন উপকারটা হবে?

কাঁটাগাছগুলো বলল, এই বনে পাখি নেই, পোকা নেই। আমাদের এক ফুলের থেকে পরাগ নিয়ে অন্য ফুলের রেণুতে মিশিয়ে দেবে কে? রেণুর সঙ্গে পরাগ না মিশলে আমাদের ফল হবে কেমন করে? কেমন করে আমরা বনের একদিক থেকে আরেকদিকে ছড়িয়ে পড়ব?

একদিন যে-বন অশথ, বট, আম, জামের ছায়ায় শীতল হয়ে থাকত, যে-বনে হেঁটে যেতে গেলে পায়ের তলায় তুলোর গদির মতন ঘাস আর ঝরাপাতার স্পর্শ পাওয়া যেত, সেই বনেই ছড়িয়ে পড়বে এই বিচ্ছিরি কাঁটাগাছগুলো? ভাবতেই পরির গা-টা রিরি করে উঠল। সে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিল, আর একমুহূর্তও ওখানে দাঁড়াবে না। মরুক বিচ্ছিরি ক্যাকটাস গাছগুলো। চুলোয় যাক ওদের বংশবৃদ্ধির স্বপ্ন।

কিন্তু হঠাৎ তার মহুয়াদিদির শেষ কথাগুলো মনে পড়ে গেল। মহুয়াদিদি নিশ্চয় এই কাঁটাগাছগুলোর জন্যেই ওকে আরো কিছুদিন থেকে যেতে বলেছিল। আর তাছাড়া, বন তো আর ওরা নষ্ট করেনি। ওরা তো শুধু নিজেদের মনোমতন পরিবেশ পেয়ে ওখানে শেকড় গেড়েছে।

সাত-পাঁচ ভেবে পরি কটাদিন ওই ক্যাকটাসের বনে কাটিয়ে যাবে ঠিক করল, আর সেই কাটাতে গিয়েই এমন মায়ায় জড়িয়ে পড়ল, যে এত-বছরের মধ্যে ওই ক্যাকটাস- বন ছেড়ে বেরোতেই পারল না।

তুলোফুড়কি এতক্ষণ অবাক হয়ে পরির কথা শুনছিল। এবার চুপিচুপি জিগ্যেস করল, ওখানে তুমি খাও কী? কী পান করো?

পরি বলল, অবাক কাণ্ড কী জানো? ক্যাকটাসের কাঁটায় ভরা কাণ্ডের ভেতর মিষ্টি জল জমা হয়ে থাকে। কোথা থেকে পায় কে জানে। আর অনেকদিন পরে-পরে ওদের কাঁটার ডালেও ফুল আসে। সে ফুলের মধু খুব মিষ্টি। আমি ওদের বুকে জমানো সেই জল পান করি, সেই মধু জমিয়ে রেখে একটু একটু করে খাই।

সেখানে কষ্ট নেই। কষ্ট আমার অন্য জায়গায়। এক ক্যাকটাস ফুলের থেকে পরাগ

নিয়ে যখন অন্য ক্যাকটাস ফুলের দিকে উড়ে যাই, তখন কাঁটার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাই। দুপুরবেলায় যখন আগুনের মতন রোদ আর গরম হাওয়ার হলকায় কিছুতেই বাইরে বেরোনো যায় না, তখন ক্যাকটাসের জড়ানো-মড়ানো ডালপালার মধ্যে ঢুকে বসে থাকি। তখন আমার জামাকাপড় ফালাফালা হয়ে যায়।

তুলোফুড়কি বলল, তোমার মনটা খুব নরম ক্যাকটাস-পরি। তুমি ছাড়া আর কে কাঁটাগাছেদের জন্যে এত করবে বলো। কিন্তু তুমি আজ ওদের ছেড়ে এলে যে?

ক্যাকটাস-পরি বলল, আমি শুধু তোমার জন্যে এসেছি তুলোফুড়কি।

আমার জন্যে? তুলোফুড়কি অবাক হয়ে বলল। আমাকে তো এই বনের পশুপাখিরাই দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি উড়তে পারি না, ডাকতে পারি না। আমার বুকের বিচ্ছিরি কালো হৃদপিণ্ডটাকে পালকের বাইরে থেকেও দেখা যায়।

ক্যাকটাস-পরি বলল, তুমি তো পাখি নও। তাহলে পাখির মতন হতে চাইছ কেন?

আমি পাখি নই? মৌটুসি নই আমি? পরির কথা শুনে তুলোফুড়কি এত অবাক হল যে, আরেকটু হলে গাছ থেকে পড়েই যাচ্ছিল।

পরি বলল, উঁহু। মোটেই তুমি পাখি নও। তুমি একটা গাছের বীজ। যেটাকে তুমি বিচ্ছিরি কালো হৃদপিণ্ড বলছ, সেটা আসলে একটা ভীষণ সুন্দর আর ভীষণ জোরাল গাছের প্রাণ।

তুলোফুড়কি! তুমি আমার সঙ্গে ওই মরুভূমির দেশে চলো। তোমার মা যেমন পাথরের ভেতর থেকে জল টেনে তুলে তোমার মুখে দিয়েছিল, তুমিও সেইভাবে মরুভূমির নীচ থেকে জল তুলে তোমার সন্তানদের মুখে দেবে। সে আবার দেবে তার সন্তানদের মুখে।

তারপর? তুলোফুড়কির গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

তারপর আজ থেকে পঞ্চাশ কি একশো বছর বাদে শিমুলের গাছে-গাছে মরুভূমির বুক ভরে উঠবে। সেই গাছেদের ডাকে আবার মরুভূমির আকাশে মেঘ ঘনাবে। বৃষ্টি নামবে। জন্ম নেবে আরো কতশত লতাপাতা, গাছপালা।

তারপর?

তারপর গাছেদের টানে পাখিরা ফিরবে, পোকারা ফিরবে। আমাকে আর পরাগমিলনের কাজ করতে হবে না। ওরাই করবে। আর...

পরির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তুলোফুড়কি বলল, আর পরিরাও ফিরবে। তাদের মধ্যে বেশ একটা রাজপুত্রের মতন ছেলে-পরি থাকবে, যে তোমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলবে, আমাকে বিয়ে করবে রাজকুমারী?

ক্যাকটাস-পরি তুলোফুড়কিকে জড়িয়ে ধরে বলল, ধ্যাৎ।

হঠাৎই পাহাড়তলির পরিষ্কার আকাশে কোথা থেকে একটা ঝড় নেমে এল। গুড়-মুড়কি, নাচনতুর্কি আর অন্য সব পশুপাখিরা সেই ঝড়ের দাপট থেকে বাঁচবার জন্যে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল।

ঝড় থেমে যাওয়ার পর যখন সবাই আবার বাইরে বেরিয়ে এল তখন দেখল সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।

শুধু তুলোফুড়কি নেই।

মেঘের জাদুকর

ছবি : সুজিত মণ্ডল

বিপুল মজুমদার

প্রায় একমাস হল শত্রুসৈন্য দুর্গ ঘিরে রেখেছে। তাদের কামানের গোলা মাঝে-মধ্যেই এসে আছড়ে পড়ছে দুর্গ-প্রাকারে। রাজার সৈন্যরাও তার জবাবে দুর্গের ভেতর থেকে শত্রুপক্ষকে লক্ষ করে কামান দাগছে। দু'পক্ষ থেকেই পরস্পরের দিকে উড়ে যাচ্ছে অসংখ্য তীর। এমন এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে রাজা চন্দ্রকেতু আজ সপার্ষদ আলোচনায় বসেছেন আশু কর্তব্য স্থির করতে। গুপ্তচর খবর পাঠিয়েছে কয়েকদিনের মধ্যেই শত্রুপক্ষ নাকি দলে ভারী হয়ে জোরদার আক্রমণ শানাবে। দুর্গে ঢোকার প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে তারা। তবে এ তো গেল বাইরের কথা। ভেতরের খবরও ভালো নয়। দুর্গে যা রসদ ছিল তা দিয়ে মাসখানেক ভালোই চলে গেছে। কিন্তু এবার তাতে টান ধরেছে। দ্বিমুখী সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে তড়িঘড়ি তাঁর এই সভার আয়োজন। রাজা চন্দ্রকেতু আত্মসমর্পণের ঘোরতর বিরোধী। সভাসদদের কাছে সমস্যাটা তুলে ধরে বললেন, 'আমার বিচারে অনাহারে মরার চেয়ে যুদ্ধ

করে মরাই শ্রেয়।'

রাজার বক্তব্য শুনে বৃদ্ধ মন্ত্রী দেববর্মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সুদীর্ঘ তিরিশটা বছর ধরে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের তিনি সেবা করে আসছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শে কত জটিল জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর সেই তিনি থাকতেই রাজাকে কিনা অকালে প্রাণ দিতে হবে! বৃদ্ধ মন্ত্রী দেববর্মার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। এত সহজে রাজাকে মরতে দেওয়া চলে না! সবে বছরখানেক হল রাজা বিয়ে করেছেন। এখনও চন্দ্রবংশে কোনও উত্তরাধিকারীর আগমন ঘটেনি। এই সময়ে রাজার মৃত্যু মানে চন্দ্রবংশের নিশ্চিত অবলুপ্তি। তিনি তাই চিন্তিত কণ্ঠে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, যুদ্ধ করলে মৃত্যু যদি নিশ্চিত তবে আপনার যুদ্ধ করে লাভ নেই! চন্দ্রবংশের শিবরাত্রির সলতে আপনি। আপনাকে আমরা হারাতে চাই না। আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন তবে বলি, আপনি গোপনে দুর্গত্যাগ করুন মহারাজ। বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে একদিন না একদিন এ দুর্গ আপনি ঠিক পুনর্দখল করতে পারবেন। কিন্তু আপনি না থাকলে তার কোনও উপায়ই থাকবে না!'

মন্ত্রীর পরামর্শ শুনে ভুরু কোঁচকালেন চন্দ্রকেতু, 'আমাকে আপনি কাপুরুষের মতো পালাতে বলছেন, মন্ত্রীমশাই!'

মন্ত্রী দেববর্মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'এটা পালানো নয় মহারাজ, এ হল যুদ্ধের কৌশল! যুদ্ধে জিততে হলে কখনও কখনও দু'পা এগিয়ে চার পা পিছোতেও হয়!'

মন্ত্রী দেববর্মার কথায় কয়েকজন সভাসদ জোরগলায় সায় দিলে রাজা চন্দ্রকেতু ভাবনায় পড়লেন। রানি মিতাবাঈ মাস দেড়েক হল পিতৃগৃহ জ্যোতিষ্কনগরে গিয়ে রয়েছেন। ভাগ্যিস গিয়েছিলেন নইলে আজ তাঁকেও এই দুর্গের গোরাটোপে বন্দি হয়ে থাকতে হত। জ্যোতিষ্কনগরের রাজা বীরসিংহ মিতাবাঈয়ের পিতা। মন্ত্রী দেববর্মা বললেন, 'আপনি দুর্গত্যাগ করে আপাতত জ্যোতিষ্ক-নগরে গিয়ে আশ্রয় নিন। এরপর শ্বশুর- শ্যালকের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করবেন।'

বৃদ্ধ মন্ত্রীর কথায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন চন্দ্রকেতু, 'দুর্গত্যাগ করব বললেই তো করা যায় না মন্ত্রীমশাই। শত্রুসৈন্য চারিদিক থেকে দুর্গটাকে ঘিরে রেখেছে। পালাবার কোনও পথই নেই!'

'একটা পথ আছে মহারাজ।' পূর্তমন্ত্রী শৃঙ্গধর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'দুর্গের ভেতর থেকে বাইরে বেরোনোর একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ আছে। সুড়ঙ্গের শেষ মাথাটা নদীর ধারে এক পোড়ো মন্দিরের ভূগর্ভে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওই পথ ধরে গেলে আপনি নিশ্চয় পালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।'

মহারাজ মাথা দোলালেন, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয় মশাই। আমার কাছে খবর আছে, আপনি যে নদীর ধারের পোড়ো মন্দিরের কথা বলছেন তার আশেপাশে শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকটা শিবির বসানো হয়েছে। গুপ্তচরের পায়রা মারফত খবর পেয়েছি ওইসব শিবিরের সৈন্যরা নদীর পাড়ে দিনরাত টহল দিচ্ছে।'

পূর্তমন্ত্রীর কথায় মন্ত্রী দেববর্মার মুখে আশার আলো। একটু যেন হড়বড় করেই দুজনের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লেন তিনি, 'তবু মহারাজ, ওই জায়গাটাই একমাত্র দুর্বল জায়গা। যেটা দিয়ে আপনি বেরিয়ে যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে জনা দশেক দুর্ধর্ষ দেহরক্ষী থাকবে। বিপদে পড়লে তারা নিশ্চয় পথের কাঁটা সাফ করে দিতে পারবে। আমরা পায়রা মারফত নদীর ওপারে থাকা গুপ্তচরকে বলব গোটা দুয়েক নৌকা প্রস্তুত রাখতে। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলে ভালো, নইলে শত্রু নিধন করে নৌকা চেপে যত দ্রুত সম্ভব নদীর ওপারে পৌঁছে যাবেন। তারপর সেখান থেকে দ্রুতগামী অশ্বে চেপে...।'

রাজা চন্দ্রকেতু হাসলেন, 'মন্ত্রীমশাই, আপনি এমনভাবে বলছেন যেন সব জলবৎ তরলং! ছক সামান্য এদিক-ওদিক হলেই সবকিছু মাটি হয়ে যাবে। ধরা পড়লে দেশের মানুষের কাছে যেমন সম্মান খোয়াব, তেমনি শত্রু দুর্জনসিংহেরও হেনস্থার শিকার হব। না না, অন্য কোনও উপায় থাকলে বলুন।'

রাজার আপত্তিতে বৃদ্ধ মন্ত্রী আবার গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। কিছুক্ষণ ভাববার পর হঠাৎ উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলেন, 'মতলব একটা মাথায় এসেছে মহারাজ। এই ব্যাপারে জীমূতেন্দ্রকে তো আমরা কাজে লাগাতে পারি!'

'জীমূতেন্দ্র! কে জীমূতেন্দ্র?' মহারাজ একটু হকচকিয়ে গেলেন।

মন্ত্রীমশাইয়ের গোলাটে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'মেরের জাদুকর জীমূতেন্দ্রর কথা বলছি মহারাজ। এই মুহূর্তে যে লোকটা আমাদের এই দুর্গের কয়েদখানায় বন্দি!'

এক অদ্ভুত ধারার জাদুকর বটে জীমূতেন্দ্র। দেশের লোকেরা তাকে মেরের জাদুকর হিসাবে চেনে। সে মেরেদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে! তার চোখের ইশারায় মেরা আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে নিমেষে ছুটে যায়। সে যেমনটি বলে তক্ষুনি তেমনটি হয়ে যায় মেরা। ব্যাঙ হতে বললে ব্যাঙ, হাতি হতে বললে হাতি, যখন যা নির্দেশ পায় তখন তাই হয়ে যায় তারা!

নিজের কর্মদোষেই এই মুহূর্তে দুর্গের কয়েদখানায় বন্দি জীমূতেন্দ্র। মাসতিনেক আগে রানি মিতাবাঈ দুর্গের বাইরে গিয়েছিলেন নদী লাগোয়া বুড়ো শিবমন্দিরে পুজো দিতে। সঙ্গে ছিল দুজন পরিচারিকা আর জনা সাতেক রাজসৈনিক। পুজো পর্ব সাঙ্গ হলে নদীর পাড়ে বসেছিলেন দু'দণ্ড জিরিয়ে নেবেন বলে। হঠাৎ দেখলেন আকাশ ভেদ করে এক বিকটাকার কুমির তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে! শিবপুজো করবেন বলে সারাদিন উপবাসে ছিলেন রানি মিতাবাঈ। আচমকা কুমির দর্শনে ভয়ের চোটে তিনি মূর্ছা গেলেন। আসল ব্যাপারটা হল কুমির-টুমির কিছুই নয়, সবটাই জীমূতেন্দ্রর ভোজবাজি! ক'দিন আগেই রাজা চন্দ্রকেতুর নির্দেশে দেশে জাদুবিদ্যা প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে। মহারাজ জাদুবিদ্যাকে একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু জাদুকর যদি জাদুবিদ্যাই প্রদর্শন করতে না পারে তাহলে তার মূল্য কী! নদীর পাড়ে বসে মনমরা হয়ে সেই কথাই ভাবছিল জীমূতেন্দ্র। রানিকে দেখতে পেয়ে তার মাথার মধ্যে হঠাৎ এক আজব ভাবনা জিয়ে উঠল। সে তার জাদুকরী বিদ্যা প্রয়োগ করে মেরেদের সাহায্যে অবিকল এক কুমির তৈরি করে রানির দিকে ছুটিয়ে দিল! আসলে জাদুবিদ্যা দেখিয়ে রানিকে প্রভাবিত করাটাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। রানি খুশি হয়ে যদি তাকে পুরস্কৃত করতে চান তাহলে তাকে আর পায় কে! সঙ্গে সঙ্গেই রানির কাছে কালা জাদু আইন প্রত্যাহারের আবেদন জানাবে জীমূতেন্দ্র। কিন্তু বিধি বাম! পুরস্কারের বদলে কপালে জুটল চরম শাস্তি। রহস্যটা হয়তো কেউ জানতেই না কিন্তু কুমির তৈরির কাণ্ডটা যে তারই সেটা বলতে গিয়েই ফেঁসে গেল।

সৈনিকরা মূর্ছিত রানিকে পালকিতে চাপিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাকেও ধরে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। এরপর রাজার বিচারে এক বছরের কারাদণ্ড হল জীমূতেন্দ্রর। সেই থেকেই কারাকক্ষে বন্দি হয়ে আছে সে।

মন্ত্রীর কথায় জীমূতেন্দ্র সংক্রান্ত যাবতীয় কথা মনে পড়ে গেল রাজা চন্দ্রকেতুর। শুধু তো আইনভঙ্গকারী নয়, রানিকে ভয়ও দেখিয়েছে লোকটা। সেই তাকে নিয়ে কিসের এত পরিকল্পনা মন্ত্রীমশাইয়ের! রাজার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'এমন গুরুতর সংকটে ওর মতো পাজি একটা লোকের কী প্রয়োজন!'

'আপনার পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ও হয়তো আমাদের কোনও সাহায্য করতে পারে মহারাজ।' হরেক চিন্তার টানাপোড়েনে বৃদ্ধ মন্ত্রীর চোখের দৃষ্টি কোন সুদূরে যেন হারিয়ে গেল।

মহারাজের চোখে ভ্রূকুটি, 'কী ভাবে?'

'ওকে কয়েদখানা থেকে এখানে আনবার আদেশ দিন, মহারাজ। যা বলবার সব ওর সামনেই বলব।'

'ঠিক আছে, আপনি বলছেন যখন তখন নিয়ে আসাই হোক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার আদেশ মোতাবেক দুজন রক্ষী গিয়ে জীমূতেন্দ্রকে কয়েদখানা থেকে বার করে নিয়ে এল। উস্কোখুস্কো চুল। গালভর্তি দাড়ি। মায়াবী দু'চোখ। গোপন কক্ষে রাজা মন্ত্রী সেনাপতি সমেত সবাইকে একসঙ্গে দেখে বেশ হকচকিয়ে গেল জীমূতেন্দ্র। মুহূর্তে ভয়ে মুখ শুকিয়ে এতটুকু। রানিকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবার তার উপর কী আরও চরম শাস্তি নেমে আসবে! মেঘের জাদুকরকে ভয়ে কাতর হয়ে পড়তে দেখে মন্ত্রীমশাই বললেন, 'ভয় পেয়ো না জীমূতেন্দ্র। শত্রুর আক্রমণে মাতৃভূমি বিপন্ন। মাসখানেক হল দুর্জনসিংহের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা দুর্গ অবরুদ্ধ। গুপ্তচর মারফত আমরা খবর পেয়েছি আর কয়েকদিনের মধ্যেই শত্রুসৈন্য দলে ভারী হয়ে দুর্গের উপর প্রবল আক্রমণ শানাবে। তাছাড়া দুর্গে খাদ্যসংকটও দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মহারাজের সুরক্ষার জন্য আমরা চাইছি তাঁকে দুর্গ থেকে বার করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু সমস্যা হল দুর্গ থেকে বাইরে যাওয়ার একটাই মাত্র সুড়ঙ্গ পথ। আর বাইরে সুড়ঙ্গমুখের আশপাশে নদীর পাড় বরাবর শত্রুসৈন্যের কিছু শিবির রয়েছে। কিন্তু মহারাজকে যে করেই হোক নদীর ওপারে যেতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে আমরা তোমার সাহায্য চাই। তোমার জাদুশক্তির সাহায্যে যদি কোনও চমক দেখাতে পার তাহলে আমরা দুশ্চিন্তামুক্ত হই। অবশ্য এর বিনিময়ে আমরা তোমাকে পুরস্কৃত করব। অচিরেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবে তুমি!'

জীমূতেন্দ্রকে কয়েদখানা থেকে বার করে নিয়ে এল

মন্ত্রীমশাইয়ের কথায় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জীমূতেন্দ্র। সে ভেবেছিল শূলে চড়ানোর আদেশ শোনানোর জন্য হয়তো তাকে ডেকে আনা হয়েছে। কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হওয়ায় তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে সে বলল, 'নিজের জাদুশক্তির উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে মন্ত্রীমশাই। আমি পারব এ কাজ করতে। তবে এই ব্যাপারে আমার একটা শর্ত আছে। রাজামশাইকে শত্রুর আওতা থেকে নিরাপদে বার করবার বিনিময়ে দেশ থেকে জাদুবিদ্যা নিরোধক আইন তুলে নিতে হবে।'

জীমূতেন্দ্রর কথা শুনে ক্রুদ্ধ সেনাপতি। কোষ থেকে তরবারি বার করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে চন্দ্রকেতু হাত তুলে সেনাপতিকে থামালেন। সামান্য বিস্মিত হয়েই জীমূতেন্দ্রকে বললেন, 'তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়

জাদুকর। ঠিক আছে তোমার শর্তে আমি রাজি। এবার বলো কিভাবে কাজটা করবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে একাগ্রমনে কী যেন ভাবল জীমূতেন্দ্র। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আগামীকাল দুপুরবেলা সূর্য যখন সোজাসুজি মাথার উপরে এসে হাজির হবে সেইসময়ে আমার জাদুশক্তিবলে সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে যাবে মহারাজ। দিনের বেলাতেই রাতের মতো ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! আশা করি সেই সুযোগে আপনি নদীর পাড়ে পৌঁছে যেতে পারবেন। এক সাধুর বরে মেঘেদের নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি মহারাজ। যদিও কোনওদিন এমন কঠিন কাজ আমাকে করতে হয়নি তবু মাতৃভূমির স্বার্থে এবার আমি তা করে দেখাব। জাদুশক্তি যে শুধু রং-তামাশা নয়, এ যে মানুষের কল্যাণের কাজেও লাগতে পারে এবার সেটা প্রমাণ করে ছাড়ব!'

রাজামশাই হাসলেন, 'সত্যিই যদি কাজটা করতে পার তবে তোমায় আমি পুরস্কারে পুরস্কারে ভরিয়ে দেব। প্রয়োজন হলে রাজদরবারে তোমার জন্য একটা নতুন পদও আমি সৃষ্টি করব।'

রাজার কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল জীমূতেন্দ্র, 'ওই ঘটনার আগে-পরে আমার আরও কিছু পরিকল্পনা আছে মহারাজ। আপনি নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যাবার পর মেঘে মেঘে এমন সংঘর্ষ ঘটাব যে মেঘ ভেঙে প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমে আসবে। সঙ্গে বজ্র- বিদ্যুৎ। সেই ঘোর দুর্যোগের সুযোগে সেনাপতিমশাই দুর্গের সৈন্যদের নিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার মনে হয় শত্রুসৈন্য চোখে সর্ষেফুল দেখবে। দুর্জনসিংহ দলবল সমেত পালিয়ে যেতে পথ পাবে না!'

জীমূতেন্দ্রর পরিকল্পনা শুনে রাজা চন্দ্রকেতুর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তোমাকে শুধু জাদুকর ভেবেছিলাম কিন্তু তুমি তো দেখছি একজন ভালো পরিকল্পকও! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো মগজ তোমার। ঠিকই বলেছ তুমি, এইরকম কিছু একটা করলেই আখেরে দুর্জনসিংহকে জবরদস্ত ঘোল খাওয়ানো যাবে।'

জীমূতেন্দ্রর সঙ্গে কথা শেষ করে সেনাপতির দিকে ফিরলেন চন্দ্রকেতু, 'সেনাপতিমশাই, আপনি জীমূতেন্দ্রর সঙ্গে এই ব্যাপারে ভালো করে কথা বলে নেবেন। শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজটা আপনার। পরিকল্পনা সফল হলে দুর্জনসিংহকে মোক্ষম একটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।'

পরদিন সকালবেলা তথ্যমন্ত্রী তাঁর পায়রা মারফত নদীর ওপারের গুপ্তচরকে সংবাদ পাঠালেন মাঝিসমেত দু'খানা নৌকা প্রস্তুত রাখতে। দুপুরবেলা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলে নৌকাগুলো যেন নিঃশব্দে নদীর এপারে চলে আসে। এছাড়া নদীর ওপারে বারোটি দ্রুতগামী অশ্বও যেন মজুত রাখা হয় সেই নির্দেশও দিয়ে রাখলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে পায়রা মারফত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করা হলে নিশ্চিন্ত হলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি খবরটা রাজার কানে তুলতেই রাজামশাইও প্রস্তুত হতে শুরু করলেন। রাজার নির্দেশে তাঁর সঙ্গে যাবেন বৃদ্ধ মন্ত্রী আর দশজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। সেইমতো সবাই যখন প্রস্তুত হচ্ছে সেইসময় জীমূতেন্দ্র এসে মন্ত্রীমশাইকে বলল, 'মন্ত্রীমশাই, দুর্গের মাঝখানে ওই যে উঁচু মিনারটা আছে ওর মাথায় আমাকে উঠতে হবে। সূর্য এখন বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়েছে। ঠিক যখন মাথার উপরে আসবে তখন আমি আমার কাজ শুরু করব। এখন আমি চললাম।'

জীমূতেন্দ্র মিনারের মাথায় উঠে পড়বার কিছুক্ষণ বাদে সূর্য যখন অনেকটা মাথার উপরে তখন আকাশ জুড়ে সহসা মেঘেদের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। রাজামশাই দলবল নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়বার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দুর্গের ভেতরকার সকলের চক্ষু চড়কগাছ। আকাশজুড়ে যেন জন্তু-জানোয়ারের মেলা বসে গেছে! মেঘেরা দলা পাকিয়ে কখনও বাঘ হচ্ছে, কখনও বা হাতি! আকাশজুড়ে পশুদের মেলা দেখে দুর্জন-সিংহের সৈন্যদের মধ্যেও শোরগোল পড়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই দেখা গেল পশুরা অদৃশ্য হয়ে আকাশময় শুধু পাখি আর পাখি। দুর্জনসিংহের সৈন্যরা এমন দৃশ্য জীবনে দেখেনি। তারা হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়েই রইল।

এমন অদ্ভুতুড়ে দৃশ্যের মাঝখানেই সময়ের নিয়মে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর চলে এল তখন পাখিরা সব উড়ে গিয়ে হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ভরে উঠল। দেখতে দেখতে চরাচর ঢাকা পড়ল নিকষ কালো অন্ধকারে। ঠিক সেই সময়ে সিকি মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ ভেঙে পোড়ো মন্দিরের গর্ভগৃহের গুপ্ত দরজা খুলে সদলবলে বাইরে বেরিয়ে এলেন মহারাজ। আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ায় বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক হাত দূরের জিনিসও ঠিকমতো ঠাওর করা যাচ্ছে না। ভাগ্যি ভালো দলে একজন খর নজরের রক্ষী রেখেছিলেন মন্ত্রীমশাই। কুকুর-বেড়ালের মতো অন্ধকারেও ভালো দেখতে পায় লোকটা। তাকে অনুসরণ করে খুব সন্তর্পণে গোটা দলটা পৌঁছে গেল নদীর পাড়ে।

দিনের বেলা রাতের মতো অন্ধকার নেমে আসায় নদীর পাড়ের শত্রুসৈন্যরাও হতচকিত। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় খানিক আগেই তারা নিজেদের শিবিরের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেই অবসরে নদীর ঘাটে দু'খানা নৌকা নিঃশব্দে এসে ভিড়লে তারা কিছু মালুমই পেল না। বাধাহীনভাবে নৌকায় উঠে স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন মন্ত্রীমশাই। নদীর ওপারে গিয়ে চন্দ্রকেতুকে বললেন, 'দেখুন মহারাজ আকাশের কী অবস্থা। মনে হচ্ছে এখুনি সেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হবে!'

রাজামশাই গম্ভীর। উত্তর না দিয়ে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন একঝলক। তিনি তাকানো মাত্রই দুর্গের উপরে মেঘেরা একযোগে গর্জন করে উঠল। বিদ্যুতের রূপালি আলো এঁকেবেঁকে আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে তীব্রগতিতে ছুটে গেল। হাওয়া বইতে শুরু করল শনশন বেগে। প্রকৃতির এই রুদ্ররূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ রাজামশাই দেখলেন একঝাঁক তেজি ঘোড়া নিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েকজন তাঁদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। তার মধ্যে গুপ্তচর বংশীধারীও আছে। বংশীধারীকে দেখে রাজার মুখে স্বস্তির হাসি। মন্ত্রী দেববর্মাকে বললেন, 'মেঘের জাদুকর ওর কাজ ঠিক ঠিক করে দিয়েছে মন্ত্রীমশাই। এবার সেনাপতি যদি সফল হয় তাদের ওকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি আমাদের পূরণ করতে হবে। আপনি দেখবেন তার যেন কোনও অন্যথা না হয়।'

মন্ত্রীমশাই ঘাড় নেড়ে কিছু একটা বললেন বটে কিন্তু বৃষ্টিপাতের তীব্র শব্দে তার একটা শব্দও রাজার কর্ণগোচর হল না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০ অগাস্ট ঃ গোয়েন্দা হব ঠিকই হয়ে আছে। জে কে দাদু বলেছে আমার সাহায্য লাগবে এরকম কেস এলেই আমাকে খবর দেবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে আমার প্রথম কেস চলে আসবে আমি ভাবিনি। যদিও এতে ফি নেই, তা হোক বন্ধুর জন্য এটুকু করাই যায়। বিশেষ করে তার যখন এইরকম ভয়ঙ্কর বিপদ। আমি নিজেও জানি না কী করে এটা সলভ্ করব। একদম প্রথম থেকে লিখে রাখি আমার প্রথম কেস হিস্ট্রি। ভবিষ্যতে যখন আমার জীবনী লেখা হবে তখন কাজে লাগবে।

টিফিনের সময় পাঁচিলের ওপর আমার পোষা বেড়ালটাকে না দেখতে পেয়ে আমি ওকে খুঁজবার জন্য জলের ট্যাঙ্কের ওপর উঠে দেখি গৌরব টিফিন বাক্স খুলে বসে আছে। দোকান থেকে বাক্স করে আমরা মাঝে মাঝে যে সব খাবার আনি গৌরব রোজই সে সব খাবার টিফিন আনে। আমি লক্ষ করেছি পড়াশোনায় ভালো ছেলেদের মায়েরা রান্নায় ভালো হয়। গৌরব এত ভালো টিফিন আনে বলে টিফিনের সময় আমাদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আমি ওকে একা এতদূরে দেখে ভাবলাম আজ নিশ্চয়ই খুব ভালো কিছু। তাই একেবারে সবার চোখের আড়ালে এসে বসেছে। ঝুপ করে ওর সামনে লাফিয়ে পড়লাম, ভাবলাম চমকে যাবে। কিন্তু আমাকে অবাক করে ও উদাস হয়ে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। সামনে টিফিন বাক্স খোলা। আমাদের সবার যেটা সবথেকে বাজে লাগে সেই জ্যাম স্যান্ডউইচ। ও একটাও খায়নি, চুপ করে বসে আছে।

তোর কী হয়েছে? জিগ্যেস করতেই গৌরব ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। তারপর চোখ মুছে নাক ঝেড়ে বলল, জানিস, মা আমাকে আর ভালোবাসে না।

কী করে বুঝলি?

দেখ কিরকম টিফিন দিয়েছে।

কী বোকা ছেলে! আমি ভাবছি আমার মতো মারধোর খাচ্ছে বুঝি। ভালো ছেলে অভ্যেস নেই তাই ভেঙে পড়েছে। ওকে চিকারাসাইজটা শিখিয়ে দিলে ব্যাপারটা সহজ হবে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুই মন খারাপ করিস না। আমাদের ক্লাসে চল্লিশজনের মধ্যে তিরিশজনই বেশিরভাগ দিন জ্যাম স্যান্ডুইচ আনে। তাহলে তো আমাদের মারাও আমাদেরও ভালোবাসে না। মা-রা এইরকমই। যখন যা সুবিধে সেটাই করবে। তোর ভালো খেয়ে অভ্যেস বলে ওরকম মনে হচ্ছে।

গৌরব তবু মন খারাপ করে বসে রইল। বলল, কাল বাংলা ব্যাকরণে গোল্লা পেয়েছি যা জীবনে পাইনি। আমি যে আড়াই পেয়েছি সেটা আর বললাম না। মিছিমিছি ওর মন খারাপ করিয়ে দিতে চাই না। তার বদলে বললাম, আন্টিকে বলিসনি তো? দেখ, আমি সবসময়ে সত্যের পথে থাকি। কিন্তু আমি দেখেছি তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে বড়দের এমন মন আর শরীর খারাপ হয় যে তার থেকে প্রেশার সুগার অ্যানিমিয়া স্পন্ডেলাইটিস এমন কি হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তাই বড়দের ভালোর জন্যই কিছু কিছু কথা ওদের বলতে নেই।

এরমধ্যে টিফিন শেষের ঘণ্টা বেজে গেল। গৌরবকে বললাম, চল। জয়ন্ত স্যারের ক্লাস। স্যার বলেছেন পরীক্ষা নেবেন। তুই তো ফুল মার্কস পাবি লাইফ সায়েন্সে।

গোল্লা পাব। কিচ্ছু পড়িনি।

কেন? পড়িসনি কেন?

কী হবে? মা তো কিছু বলবে না। কালও বলেনি। খাতাটা দেখে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

এর মধ্যে স্যার ঢুকেই বোর্ডে প্রশ্ন লিখতে শুরু করলেন। আমরাও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম আমি যতবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পেন্সিল চিবোলাম, গৌরবও ততবার তাই করল।

এরপরেই ছুটি হয়ে গেল। আমরা সব স্কুল বাসের দিকে দৌড়লাম তা নাহলে সিনিয়র স্কুলের ছেলেরা সবকটা জানালার ধারের সিট নিয়ে নেয়। সিনিয়র স্কুলে বড় খেলার মাঠ আর ইউনিফর্ম ফুল-প্যান্ট বলে আমার খুবই ইচ্ছে যাবার। কিন্তু একটাই সমস্যা। সিনিয়র

স্কুলে গেলেই মেয়েদের স্কুল বাস দেখলে হো হো করে চেঁচাতে হয়। বড় স্কুলের ওই নিয়মটা আমার ভালো লাগে না।

আমি আর শ্লোক জানালার ধারের সিট দখল করে বসে হজমি গুলির দুটো পুরিয়া যেই মুখে ফেলেছি অমনি আমার মাথার মধ্যে টং করে উঠল। গৌরব একটা কী যেন বলেছিল। সব ভালো গোয়েন্দাদের মতো আমারও মাথার মধ্যে একটা ঘণ্টা আছে। গোলমাল দেখলেই সেটা বেজে ওঠে। গৌরবের মা জ্যাম স্যান্ডুইচ দিতেই পারে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় গোল্লা দেখে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে এমন মা তো আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। কাল গৌরবের থেকে ভালো করে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে হবে।

১৫ অগাস্ট

আজ ছুটি বলে মা তুলি আর বুলিকে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছে। পুজোর বাজার নাকি এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। কী করে যে ওদের ভালো লাগে পাহাড়ের মতো জামাকাপড় ঘাঁটতে জানি না। আমার তো খেলনা আর খাবারের দোকান ছাড়া অন্য দোকানে ঢুকলেই দমবন্ধ হয়ে যায়। মাকে এমন বিরক্ত করি যে মা বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসে। আমার যখন একটা দোকান দেখেই হাত-পা-মাথা-চোখ সব ব্যথা করতে থাকে, ওরা তখন নতুন উৎসাহে আর একটা দোকানে ঢোকে। আবার পুরো সিনটা প্রথম থেকে শুরু হয়। বুলিকে কত বললাম যাস না। আমি আর তুই মিলে আমার কেসটা একটু স্টাডি করি। এত তাড়াতাড়ি যে আমাকে এইরকম এক সাংঘাতিক শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে সেটা আমার জানাই ছিল না।

বুলি প্রথমে বলল থাকবে পরে বিশ্বাসঘাতকের মতো ওদের সঙ্গে চলে গেল। গোয়েন্দার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট খুবই জরুরি কারণ অ্যাসিস্ট্যান্টের না জেনে হঠাৎ বলা কথা থেকে গোয়েন্দাকে রহস্য সমাধান করতে হয়। তা ছাড়া এটা সাধারণ চুরি-ডাকাতির কেস নয়। এর জন্য যে কোনো মুহূর্তে আমার প্রাণ চলে যেতে পারে।

কী আর করব। আমার জীবনে দুঃখ-বিপদ কিছু নতুন কথা নয়। তার জন্য কি ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছি? আমার মতো বীর কখনও সেটা করে না।

ভালোই হয়েছে। একলা একলাই আমি এই ভয়ঙ্কর বিপদ মোকাবিলা করব।

১৬ অগাস্ট

যখনই সময় পাচ্ছি গৌরবকে ধরে ওর মায়ের কী কী পরিবর্তন হয়েছে ভালো করে লিখে নিচ্ছি খাতায়। খুব ভালো হত যদি ওর বাড়িতে গিয়ে জায়গাটা যাকে অকুস্থল বলে দেখতে পারতাম। নিজের চোখে না দেখলে কাজটা আরও কঠিন হয়। গৌরবের কাছে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওর মা কী কী করে জেনে নিয়ে খাতায় নোট নিই। আমার খাতাগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে বলে দিদির আর্চিসের দোকান থেকে কেনা শৌখিন ডায়েরিটা নিতে হল। ইচ্ছে করে অন্য খাতাগুলোতে হাত দিইনি। কারণ ওগুলো ওর প্রায় রোজ লাগে। ডায়েরিটাতে মাঝে মাঝে কী সব লেখে। তখনই ওর মুখটা কখনো হাসি-হাসি কখনো কাঁদো-কাঁদো। তার মানে স্কুলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার মতোই ব্যাপার। অথচ দিদি কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ও ডায়েরি লেখে। যেন বাঘা করে বলেই ওটা করতে নেই।

যাকগে, ওর আবার কবে লেখার দরকার হবে তার ঠিক নেই। তার আগে হয়তো আমার কেসটাই সলভ্ হয়ে যাবে। এই যে আমি এত চিন্তা করে ওর সুবিধে করে কাজটা করলাম তার জন্য আমি যদি দুটো ভালো কথা বা ব্যবহার আশা করি তাহলে সেটা কি খুব অন্যায় হবে?

দিদির ডায়েরিটা দেখে আমার নিজের ডায়েরি বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। প্রতিটা পাতাই কাজে লাগিয়েছি। একটা লাইনও নষ্ট করিনি। কিন্তু দিদির ডায়েরিটার পাতাগুলো প্রায় খালি। কয়েক লাইন লেখার পরই পাতা ছেড়ে অন্য পাতায় লেখা শুরু করেছে। এ আবার কী কায়দা? কত পাতা নষ্ট মিছিমিছি। আমি কখনো এমনি করি না। একটা পাতায় দেখলাম খুব ঢেউ খেলিয়ে বি এ লিখে একটা ড্যাশ তারপর বড় করে লেখা খুব খুব হ্যান্ডসাম। নিশ্চয় বাবার কথা লিখেছে। আর একটা বি এ লেখেনি। এটা বোধহয় ওর নতুন কায়দা। একে পাতা নষ্ট তারপরে ভুল কথা। তাই একটু ঠিক করে লিখে দিলাম—দাদাই বেশি।

যাই হোক আমি নতুন পাতায় না লিখে লেখা পাতাগুলোই ব্যবহার করব ঠিক করেছি।

২২ অগাস্ট

গৌরব দু'দিন ধরে স্কুল আসছে না।

২৫ অগাস্ট

গৌরব এই পুরো সপ্তাহটা স্কুলে আসেনি। এটা যে কী ভীষণ চিন্তার ব্যাপার সে শুধু আমি জানি। আমি সমানে ভাবছি কী করা যায়। এটা লিখে রাখা দরকার। পৃথিবীর আর কোনো গোয়েন্দা এত অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হলে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিত। অকুস্থলে যেতে পারছি না। একটা সাইকেল চেয়ে চেয়ে পেলাম না। মক্কেলের সঙ্গে যোগযোগ পর্যন্ত করতে পারছি না। গৌরব যদিও আমাকে কোনো ফি দিচ্ছে না তবু ও-ই যে আমার জীবনের প্রথম মক্কেল এটা তো মানতেই হবে।

এটা নিয়ে আমি এত চিন্তা করছি যে নিখিল স্যার কী যেন জিগ্যেস করলেন। কিন্তু তখনও আমি সমানে গৌরবের বিপদের কথা ভাবছি বলে সামনে নিজের বিপদটা দেখতে পাইনি।

নিখিল স্যার বললেন, তোর মতো ছেলেকে ঠাঁটিয়ে একটা চড় লাগাতে হয়। যা ক্লাসের বাইরে নিলডাউন হয়ে থাক।

পা থেকে জুতোটা খুলে হাঁটুর তলায় দিয়ে দিলেই চমৎকার নিলডাউন হয়ে থাকা যায়। বারান্দা দিয়ে অনেককিছু দেখা যায় বলে বেশ সময়টাও কেটে যায়। আর দুঃখ-কষ্ট আমার গা-সওয়া বলে এইরকম সময়েও আমি নতুন কথা শুনলে সেটা মনে রেখে পরে খাতায় টুকে রাখি। আজ শুনলাম ঠাঁটিয়ে চড়।

টেনে চড়, কষে চড়, ঠাস করে চড় সবগুলোই পরখ করে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ঠাঁটিয়ে চড়টা কেমন কে জানে?

আমি সবসময়েই দেখেছি আমার জীবনে একসঙ্গে দুটো-তিনটে দুঃখ আসে। টিফিনে যেদিন নোনতা সুজি সেদিনই স্কুলে একগাদা পরীক্ষা, সেদিনই ডেন্টিস্ট দেখানো। আজ স্কুলে অতক্ষণ নিলডাউন হয়ে থাকার পর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই বুলি চোখ বড় আর গলা ফিসফিস করে বলল, দিদি ডায়েরি পাচ্ছে না। ঠাম্মা ডেস্ক্রিপশন শুনে বলেছে তোমার কাছে দেখেছে।

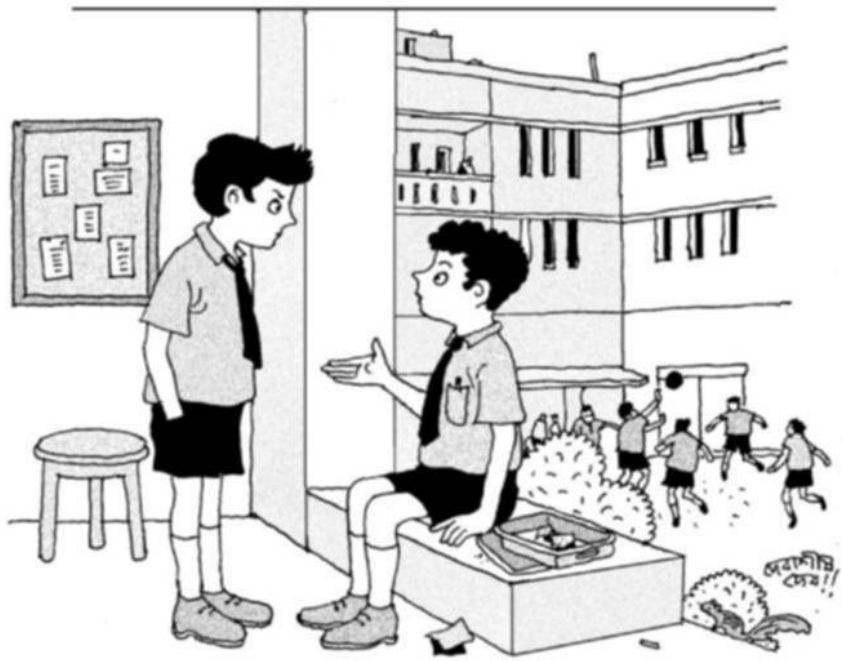

????

আক্রমণটা কোথা দিয়ে আসতে পারে ভাবতে ভাবতে স্কুল ব্যা টা রাখলাম। জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুচ্ছি আর ভাবছি কী করে আত্মরক্ষা করা যায়।

দিদি ঘরে ঢুকল, তুই আমার ডায়েরি নিয়েছিস কেন?

ঠিক প্রশ্ন করলে তার উত্তরও ঠিক করেই দিতে হবে। বললাম, আরও ভালো করে কাজে ল্া াব বলে। তুমি তো অনেক পাতা নষ্ট করেছিলে। একটা পাতায় একটা লাইন।

দিদি প্রচণ্ড রে ে আমাকে মারতে ছুটে আসছিল, খাটের কোনায় ধাক্কা খেয়ে পা চেপে বসে পড়ল দেখে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, তা ছাড়া অনেক ভুল কথাও ছিল। সেগুলোকেও ঠিক করতে হল। তুমি যাই বল না কেন দাদাইয়ের থেকে বেশি হ্যান্ডসাম কেউ না। আরও অনেক কিছু আছে সেগুলোকেও ঠিক করতে হবে।

তাই শুনে দিদি ব্যথা ভুলে উঠে দাঁড়াল আর আমাকে কী সুন্দর দিদি দিদি, লায় বলল, তুই ঠিকই বলেছিস। আচ্ছা, ওটা তুই নিয়ে নে। তোকে একেবারে দিয়ে দিলাম। আমার আর চাই না। দে, আমার লেখাগুলো ভালো করে কেটে দিই। তারপর তুই লিখিস। সত্যি তো ডায়েরি বন্ধু হারিয়ে ে ছে বলে তোর কত দুঃখ।

দিদির ভুলটা ঠিক করে দিয়েছি শুনে মনে হয় খুশি হয়েছে। থার্টিনের ব্যাড এফেক্ট যে একেবারে কেটে ে ছে এ নিয়ে আমার আর সন্দেহ নেই। মার খাবার বদলে একটা আস্ত ডায়েরি পেলাম যাতে আমার তদন্তের ফলাফল লিখে রাখতে পারব। আর লুকোচুরি করতে হবে না। এটা ভেবে সবথেকে ভালো ল্া ছে। দিদির সঙ্গে এই ভাবটা বজায় রাখতে হবে যে করেই হোক। তাহলে বলা যায় না মাঝে মাঝে ওর কি-বোর্ডটা বাজাতেও দিতে পারে।

৩ সেপ্টেম্বর

ৌরব স্কুলে এসেছে। খুব রো া হয়ে ে ছে। বলল ভাইরাল ফিভার।

আমার তদন্ত যে একদম ঠিক পথে এগোচ্ছে তার আর একবার প্রমাণ পেলাম। ওকে জি ্যেস করলাম, এর আ তোর ভাইরাল ফিভার হয়েছে?

না। একবার ম্যালেরিয়া আর একবার পক্স হয়েছিল।

কিন্তু ভাইরাল ফিভার তো নয়। যখন ডাক্তারবাবুরা নিজেরা বুঝতে পারে না কেন জ্বর হল তখনই বলে ভাইরাল ফিভার। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কত ডেঞ্জারাস।

গৌরবের মুখটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। বলল, জানিস জ্বর হওয়া সত্ত্বেও মা আমার পাশে শোয়নি। বাবা জ্বর দেখেছে, ওষুধ দিয়েছে।

ওকে বললাম, এখন কিছুদিন চুপচাপ থাক। আর কিছুদিন দেখি তারপর ঠিক করব কী করে তোকে এই ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায়।

অনেক কাজ বেড়ে ে ছে। তদন্তের জন্য পড়াশোনা করতে হচ্ছে আর তার থেকে ক্রমাগত এত নোট নিতে হচ্ছে যে স্কুলের কাজ প্রায় বন্ধ বললেই হয়। শুধু শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্য ক্যারাটে প্র্যাকটিসটা বাড়িয়ে দিয়েছি।

৬ সেপ্টেম্বর

আমার জীবনে এই প্রথম এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটাকে একসঙ্গে ভালো-খারাপ দুই-ই বলা যায়। ক্যারাটে প্র্যাকটিস করতে ি য়ে পায়ে খুব ব্যথা পেয়েছি। বাবা পারলে ওই ব্যথার ওপরেই মেরে দেয় আর কি। ঠাম্মা ঘ্যান ঘ্যান করে সমানে নালিশ করে যাচ্ছে, স্কুল থেকে আসা মাত্রই ঘোড়ার মতো হাত-পা ছুঁড়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় ওই দুর্দান্ত ছেলে। তোমরা তো তখন থাক না তাই জান না। আজ পা ে ছে

কাল মাথা যাবে। বাড়ির একটি জিনিসও বাঘা আস্ত রাখবে না। এই আমি বলে দিলাম।

ঠাম্মার কথা শুনে মনে হচ্ছে পর পর এইসব দুর্ঘটনাগুলো না ঘটলে ঠাম্মাই সবথেকে বেশি দুঃখ পাবে।

মা জিগ্যেস করল, কিরে খুব বেশি ব্যথা করছে?

যদিও বেশ ব্যথা করছে তবুও বললাম, বেশি না একটু।

গোড়ালিতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছি। তিন সপ্তাহ বেশি হাঁটাচলা বারণ। বাথরুম আর খাবার টেবিলে শুধু যাচ্ছি। এর মধ্যে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া টাইফয়েড জন্ডিস কত ভালো ভালো অসুখ আছে, যে কোনো একটা হয়ে গেলেই একেবারে পুজোর ছুটির পর স্কুলে যাব। তার মধ্যে নিখিল স্যার নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন। আসলে তদন্তের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে পড়াশুনোর মতো অদরকারি জিনিসটা করাই হচ্ছিল না। নিখিল স্যার তাই বাবাকে ডাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন। বড়দের তো বোঝানো যাবে না আমি যে কাজটা করছি সেটা করা কত জরুরি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে খুব ভালো সময়ে পায়ে চোট লেগেছে। এটা যেমন ভালো হল, তদন্তটা পিছিয়ে গেল সেটা খারাপ হল। যাই হোক ছুটিটা ভালো করে কাজে লাগাতে হবে। রেফারেন্স বইগুলো ভালো করে পড়ে নোট নেব, বাকি সময় চিল্কাদের দেখব। উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি আর খাতায় লিখছি, পিঠের ওপর একটা ছায়া পড়ল। পুরো খাটটা ছায়ায় ঢেকে গেছে মানে ওটা ঠাম্মার ছায়া। ঠাম্মা বলল, একেবারে দাদুর নাতি। দাদুর পা ভেঙেছিল অতএব তোমাকেও ভাঙতে হবে।

আমার মোটেই ভাঙেনি। শুধু লিগামেন্টে চোট লেগেছে।

ভালো। এরপর তাহলে ভাঙবে। সারাদিন গুন্ডা-বদমাশের মতো মারামারি প্র্যাক্টিস। ছি ছি তুমি না ভদ্রঘরের ছেলে? আর এসবের ফল কী হচ্ছে সে তো হাতেনাতেই দেখতে পাচ্ছ। বোনেরা এত ভালো, এত লক্ষ্মী, একটুও কি তোমার ওদের মতো হতে ইচ্ছে করে না?

কানের এক্সারসাইজটা শুরু করব কিনা ভাবছি তখনই শুনতে পেলাম দাদাই ঠাম্মাকে ডাকছে। এগুলো আমাকে রক্ষা করার জন্য দাদাইয়ের চালাকি। যদি ঠাম্মাকে সরিয়ে না নিত তাহলে 'পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জাগি'র মতো ঘুম থেকে উঠেও ঠাম্মার কথা শুনে যেতে হত।

শুনলাম দাদাই বলছে, সবসময় তুলনা কর কেন? সবাই চায় বাবুরাম সাপুড়ের ওই দুটো সাপ। সেটা কী সম্ভব?

তার উত্তরে ঠাম্মা বলল, তুমি থাম। তোমার আশকারাতেই বাঘা এইরকম বিগড়ে যাচ্ছে।

বড়দের এসব কথা শুনলেই আমার হাই ওঠে। তবে পরে একসময়ে দাদাইকে বলব বাবুরাম সাপুড়ের ওই যে সাপগুলোর চোখ নেই, কান নেই, ফোঁসফোঁস করে না, কারোকে কামড়ায় না, ওগুলোর ওপর আমার খুব লোভ। যদি পাই তো নিশ্চয়ই পুষব। তারপর স্কুলে রচনা খাতায় পেট অ্যানিম্যাল লিখতে বললে সবাই লিখবে ডগ, ক্যাট, বার্ড। আমি স্নেক লিখব যেটা আর কেউ পারবে না। বুলিটা এত বোকা ও কত কিছু লিখতে পারে ওর পেট ধিনিকেষ্টদের নিয়ে কিন্তু বাড়ির লোক ছাড়া ও আর কারোকে কেন যে বলতে চায় না জানি না।

(চলবে)

● নতুন বই ●

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত
মরণের ডাক ৩৭৫.
১০টি রহস্য-রোমাঞ্চ কিশোর উপন্যাস সমগ্র

রূপা মজুমদার সম্পাদিত
নবকল্লোল-এর পঞ্চকন্যা ৩০০.
(মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেব সেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সর্বাণী মুখোপাধ্যায়, কাবেরী রায়চৌধুরী)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঁচটি বাছাই উপন্যাস ৪৫০.

সমুদ্র বসু সম্পাদিত
গা ছমছম
রহস্য-রোমাঞ্চ-ভৌতিক (গল্প সংকলন) ৪০০.

সুভাষ ধর
হত্যার পশ্চাদপট ১৭৫.

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
ভয়নিচের অজানা ভাষা ও আরো বারো ২০০.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্বাচিত পঞ্চাশ ৪০০.

রূপক চট্টরাজ সম্পাদিত
শুকতারা-র ১০১
রূপকথার গল্প ৩৫০.

● নতুন বই ●

অনীশ দেব
বাড়িটায় কেউ যেয়ো না ১৫০.

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
ভয়ংকর স্বীকারোক্তি ১৮০.

সৈকত মুখোপাধ্যায়
মৃত রাজা জাগো ১৩০.

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
দূরভাষ- ২৩৫০-৪২৯৪, ৪২৯৫,৭৮৮৭
ওয়েবসাইট- www.devsahityakutir.com
ই-মেল- dev_sahitya@rediffmail.com

ছবি : রঞ্জনীল ঘোষ

দুই নদীর গল্প

মহুয়া মল্লিক

দূরের পাহাড়ের দেশে যেখানে গাছেদের মাথায় মাথায় থোকা থোকা মেঘ ঝুলে থাকে সেখানে বহু বছর আগে থাকত এক ছেলে আর এক মেয়ে। একই গ্রামে পাশাপাশি তাদের বাড়ি। ছেলেটির নাম রোংগিত আর ফুলের মতো মিষ্টি মেয়েটির নাম রোংনিয়া। ছোট থেকেই তাদের ছিল খুব বন্ধুত্ব। একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে তারা বড় হয়ে উঠল। বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হল। একসময় তারা দুজনেই ঠিক করল একে অপরকে বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করবে।

যেমন ভাবা! ছেলে তার বাড়িতে আর রোংনিয়ার বাড়িতে জানিয়ে দিল। কিন্তু দুজনের বাবা-মা এ কথা শুনে দারুণ রেগে গেলেন। রোংগিতের বাবা তো দুজনের মেলামেশা বন্ধ করার হুকুম দিলেন। আর রোংনিয়ার বাড়িতেও শুরু হল একই ঝামেলা। মেয়ে তখন গাছের নীচে মুখ নিচু করে বসে পোষা চমরি গাইয়ের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল। তার বাবা ঘরে ঢুকলেন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। তিনিও মেয়েকে শাসন করে ঘরের মধ্যে আটকে রাখলেন। মেয়ের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দুজনের বাবা-মা বলে দিয়েছেন তারা অবাধ্য হলে দুজনকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ছেলে আর মেয়ের মনোকষ্ট বাড়ে। রোংনিয়া উদাস মুখে ঘরকন্নার কাজ সারে। কখনো আবার সবার চোখ এড়িয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চঞ্চল চোখে রোংগিতকে খোঁজে। দূর থেকে সারাদিনে পাথুরে জমিতে খেটে ক্লান্ত বাবা-মা'কে বাড়ি ফিরতে দেখে তারপরেই তার সম্বিত ফেরে। বাবা-মায়ের চোখে ধরা পড়ার আশঙ্কায় আবার ভিতর বাড়িতে পালিয়ে আসে।

আর রোংগিত! তার অবস্থা দেখলেও চোখ ফেটে জল আসে। শুকনো মুখে বাঁশিখানি হাতে নিয়ে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে হারিয়ে যায়। তারপর তার সেই পছন্দের ঝুপড়ো পাতায় ছাওয়া গাছটার নীচে বসে থাকে আর বাঁশিতে সুর তোলে। সেই করুণ সুরে পাহাড় কেঁদে ওঠে। চাপ চাপ আঁধার নামলে তবে সে বাড়ি ফেরে।

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর দুজনেই একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে সবার অলক্ষে নির্জন বনভূমিতে দেখা করল। ঠিক করল বাড়ি ছেড়ে, এই পাহাড়ি গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে। যেখানে চোখ লাল করে শাসানোর কেউ নেই, যেখানে কেউ ওদের চেনে না। সেখানেই ওরা ঘর বাঁধবে।

অনেক শলা-পরামর্শ করে ঠিক হল দুজনেই আর বাড়ি ফিরবে না। বরং দুজন দুটি আলাদা আলাদা পথে চলতে শুরু করুক। পেশোকে তাদের দেখা হবে। যে আগে পৌঁছবে সে অন্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে। ছেলে ভীষণ সাবধানী। এইভাবে আলাদা আলাদা পথে চললে কেউ সন্দেহ করবে না। আর দুজন একসঙ্গে কারুর চোখেও পড়ার সম্ভাবনাটুকুও থাকবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। দুজনে সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি রাস্তায় পথ চলতে শুরু করল।

রাত যায় দিন যায়। দুজনের চলা থামে না। খিদে পেলে গাছের ফলমূল, তৃষ্ণা পেলে ঝরনার সুস্বাদু জল তো আছেই। রাত্রে বিশ্রাম নেয় পাহাড়ি গুহায় বা উঁচু গাছের ডালে। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দুজনেরই মন খারাপ করে। ফেলে আসা বাড়িঘর, বাবা-মা, ছোট ছোট ভাইবোন, খেলার সাথী আর অবলা পুষ্যিগুলির জন্য মন কেমন করে ওঠে।

কোনোদিন মধ্যরাত্রে বন্য জন্তুর হুঙ্কারে রোংগিত জেগে ওঠে। শক্ত করে গাছের ডাল ধরে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়। আর ভাবে

রোংনিয়া বেচারি এই নিকষ কালো আঁধারে না জানি কেমন করে ভোরের আলোর প্রতীক্ষা করছে! কাল থেকে চলার গতি বাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি পেশোকে পৌঁছতে হবে।

সকালের ঝলমলে আলোয় রাত্রির মালিন্য মুছে যায়। দুজন দুজনের অজান্তে নিজের মতো করে পথ চলতে শুরু করে। মেয়ের পায়ে হরিণীর গতি। তার আর তর সয় না! কখন পৌঁছবে? কখন প্রিয় সখার সঙ্গে দেখা হবে! সে দু'পাশের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যকে উপেক্ষা করে ছুটে চলে।

ছেলে কিন্তু চলার পথে বারবার গতি হারায়। অরণ্যের সবুজ মাদকতা, ফুলেদের রঙের উৎসব, পাখিদের কলতানের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারে না। দু'চোখ ভরে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বারবার পিছিয়ে যায়। প্রজাপতির ডানার রঙ মেখে, ঝরনার দু'আঁজলা জল খেয়ে তার ঘোর ভাঙে। মনে পড়ে রোংনিয়ার কথা। আবার সে গতি বাড়ায়।

রোংনিয়া একদিন পেশোকে পৌঁছে যায়। রোংগিতকে খোঁজে। কোথায় সেই পাগল ছেলে? তবে কি রোংনিয়াকে পথের মধ্যেই ভুলে গেল! নাকি হুরি-পরি কেউ এসে তার কাছ থেকে তার সখাকে কেড়ে নিয়ে গেল! অভিমানে মেয়ের ঠোঁট ফুলে গেল। বুকের মধ্যে থমথমে মেঘ জমল। দু'চোখ যেন টলটলে জলে ভরা নদী। মন খারাপ করে সে বসে রইল।

এদিকে রোংগিত বুঝতে পারে সে বড্ড দেরি করে ফেলেছে, তাকে এবার পৌঁছতেই হবে না হলে অভিমানী কন্যার মুখ ভার হবে, সে প্রকৃতির কুহকী মায়া ভুলে ছুটতে শুরু করল। একদম থামল পেশোকে পৌঁছে। রোংনিয়াকে দেখে ভারী অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, থিস্তা! থিস্তা মানে আগেই পৌঁছে গেছ! সেই থেকে রোংনিয়ার নাম হল 'তিস্তা'।

মেয়ের কিন্তু তীব্র অভিমান। কিছুতেই সে মুখে কুটোটি কাটে না। দিন-রাত মুখ ভার করে বসে থাকে। রোংগিত তার অভিমান ভাঙাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, 'আচ্ছা আর কখনো তোমায় একলা ফেলে হারিয়ে যাব না, কথা দিলাম। এবার তো হেসে ওঠো।'

রোংনিয়া এবার ধীরে ধীরে জলভরা টলটলে দু'চোখ তুলে তাকাল তারপর ধীরে ধীরে বলে উঠল, 'বেশ যদি তুমি আমার বুকের উপর দিয়ে যুগ যুগ ধরে বয়ে যাবে কথা দাও, তাহলে আমি আর রাগ করে থাকব না। আমরা এভাবে চিরকাল একসঙ্গে থাকতে চাই।'

ছেলে তো এক কথায় রাজি। ধুমধাম করে পেশোকে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করল। প্রতিশ্রুতি মতো তিস্তার বুকের উপর দিয়ে রোংগিত বয়ে যেতে লাগল।

আজও তারা একইরকমভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটু নজর করলেই দেখা যাবে রোংগিতের রঙিন জলস্রোত, তিস্তার টলটলে স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই পেশোকে যেখানে প্রথমবার একসঙ্গে মিলেছিল দুই প্রাণের সঙ্গী।

(লেপচা উপকথা)

স্বাধীনতার ৭০ বর্ষ পূর্তিতে শুকতারার নিবেদন—বিপ্লবীদের দুরন্ত দামাল কৈশোর

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

পীযূষকান্তি সরকার

ছেলেটির মুখমণ্ডল খুব সুন্দর—ধবধবে ফর্সা মুখে সর্বদাই হাসি লেগে আছে। দারুণ বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মুখের হাসি কোনোদিন ম্লান হয়নি তার। যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমনই তীব্র দেশাত্মবোধ। এই ছেলেটিই পরবর্তীকালে বুড়িবালামের তীরে ঘটা ভয়ানক যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত।

বাঘাযতীনের সহযোগী নীরেন দাশগুপ্তের পাশের বাড়িতে থাকতেন মনোরঞ্জন। তাঁর বাবার নাম হলধর সেনগুপ্ত। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে খৈয়ারডাঙা গ্রামেই জন্ম হয় মনোরঞ্জনের—চার ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় তিনি। নীরেন দাশগুপ্তের চেয়ে ছোটো হলেও মাদারিপুর হাই স্কুলে তাঁরা একসঙ্গে পড়াশুনো করেছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসার পর মাদারিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় নীরেনের সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে আট মাসের কারাবাস ভোগ করতে হয়। এই সময় বিপ্লবের গুরু যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীনের সংস্পর্শে এসে গার্ডেনরিচ মোটর ডাকাতির কেস-এ জড়িয়ে পড়ে ফেরার হয়ে যান।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস নাগাদ ওড়িশার কপ্তিপদার জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ তাঁর চার সঙ্গী চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষকে নিয়ে ঘাঁটি গড়েন। মাউজার পিস্তল নিয়ে টিপ প্র্যাকটিস আর কুস্তির প্যাঁচ শেখা—চলছিল বেশ। অস্ত্রবোঝাই জার্মান জাহাজ ধরা পড়ে যাওয়ার পর ইংরেজ পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। চার্লস টেগার্টের মাধ্যমে খবর পেয়ে বালেশ্বর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জর্জ কিলবি এবং সার্জেন্ট রাদারফোর্ড তাঁদের বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথের মুখোমুখি হওয়ার পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। চিত্তপ্রিয়র মৃত্যু হয়। একে একে অন্যরাও আহত হওয়ার পর পুলিশবাহিনী বাকি চারজনকে গ্রেপ্তার করে। হাসপাতালে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন যতীন্দ্রনাথ। পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজদের বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হল। নাবালক জ্যোতিষকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে অত্যাচারে অত্যাচারে পাগল করে দিল ব্রিটিশ সরকার। পরবর্তীকালে বহরমপুর জেলে তাঁকে এনে রাখলেও বছর বারো পরে জেলের মধ্যেই জ্যোতিষের বীরোচিত প্রয়াণ ঘটে।

ছড়া-গড়ার আসর

পরিচালনা ঃ রূপক চট্টরাজ

তোমরা কেউ কেউ ছড়া বা কবিতা লিখবার চেষ্টা করো, তাই না? ছড়া-গড়ার আসরে একটা ছড়ার প্রথম চার লাইন লিখে দিলাম, যারা লিখতে চাও এর সঙ্গে বাকি চার লাইন লিখে ছড়াটা সম্পূর্ণ করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে এক মাসের মধ্যে। যাদের লেখা বেশ ভালো লাগবে নাম-ধামসহ সেসব লেখা আমরা ছাপাব। লেখা পাঠাতে হবে কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে।

ছড়া-গড়ার আসর শুধুমাত্র স্কুল-পড়ুয়াদের জন্য। শ্রেণি ও বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করবে চিঠিতে।

বৈশাখ মাসের ছড়া

বোশেখের তপ্ত তাপে
দুপুরের দমকা হাওয়ায়
শিমুলের গাছটা কাঁপে
বনের এই সবুজ ছায়ায়।

.....
.....
.....
.....

ফাল্গুন সংখ্যার যে ছড়াটি সেরা বিবেচিত হয়েছে

রঙ মেখেছে শিমুল পলাশ
ভরা ফাগুন মাসে
রঙ মেখেছে কৃষ্ণচূড়া
বসন্ত উল্লাসে।

রঙ মেখেছে দক্ষিণ হাওয়া
দোল ফাগুনে মন
রঙে রঙে কুহুতানে
খুশির বৃন্দাবন।।

তিয়াসা ঘোষ,
বয়স ষোলো, একাদশ শ্রেণি,
গ্রাম্যহিতকরী বালিকা বিদ্যালয়,
আন্দুল-মৌড়ি, হাওড়া

আর যাদের ছড়া ভালো হয়েছে

রং এর খেলায় মাতছে ভুবন
দোলের আবীর মেখে
কুহু রবে ভোরের কোকিল
উঠছে হঠাৎ ডেকে।

দেবাদৃতা আচার্য,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণি,
কন্টাই পাবলিক স্কুল,
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

রং মেখেছে বনবীথি,
স্নিগ্ধছায়া পলাশ বনে,
আম্রমুকুল লোভ জাগাল,
খোকা-খুকির মনে মনে।

সায়ক দে,
বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণি,
বারাসাত প্যারীচরণ সরকার উচ্চ
বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা

রং মাখা এই ফাগুনের শার্থে
বসন্তের দূত কোকিল ডাকে,
আসছে এবার খুশির হোলি
এসো সবাই রং খেলি।।

অনুষ্কা নন্দী,
বয়স বারো, অষ্টম শ্রেণি,
সারদেশ্বরী কন্যা বিদ্যাপীঠ,

দাও না এবার ফাগুন হাওয়ায়
মনের দুয়ার খুলে,
হৃদয় পাতা রাঙিয়ে উঠুক
সকল দ্বন্দ্ব ভুলে।

আয়ুষ মেইকাপ,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণি,
কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউশন,
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

এছাড়া যাদের লেখার চেষ্টা আমাদের খুশি করেছে

স্পৃহা দে,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণি,
মধ্যমগ্রাম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগনা

জয়ন্ত হালদার,
বয়স বারো, ষষ্ঠ শ্রেণি,
গড়িয়া বরদাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়,
কলকাতা

অন্বেষা নন্দী,
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণি,
শ্রীমা শিক্ষা নিকেতন,

আরভিয়া বসু,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণি,
বেলগাছিয়া রানি শতরূপা
গার্লস স্কুল, কলকাতা

ঐশী আচার্য,
বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণি,
দেবীশ্বরী বিদ্যানিকেতন
মাখলা, উত্তরপাড়া

তিস্তা চৌধুরী,
বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণি,
শিশুভারতী, শলপ,
হাওড়া

অলংকরণ ঃ প্রণব হাজরা

সংকলক ঃ মানস ভাণ্ডারী

প্রশ্ন

১. স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
২. পেরিয়ার অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত?
৩. লেবাননের রাজধানীর নাম কী?
৪. 'ককপিট অফ ইউরোপ' কাকে বলা হয়?
৫. পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্দির কোনটি?
৬. ধানগাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম কী?
৭. মাইক্রোওয়েভ ওভেন কে আবিষ্কার করেন?
৮. ফুটবল খেলোয়াড় মারাদোনার পুরো নাম কী?
৯. ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার কোন সাল থেকে দেওয়া শুরু হয়েছে?
১০. আমেরিকার জাতীয় খেলার নাম কী?

চৈত্র সংখ্যার
কুইজ কুইজের উত্তর—

১. প্যারীচাঁদ মিত্র
২. ২০০০ সালের ১ নভেম্বর
৩. পিপল্‌স কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি
৪. কায়রো
৫. মিথেন
৬. দুটি নদীর মধ্যবর্তী দেশ
৭. লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে
৮. তাম্রলিপ্ত
৯. অ্যাস্প সাপের কামড় খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন
১০. জে স্কালিগার

গ্রাফিক্স: প্রণব হাজরা

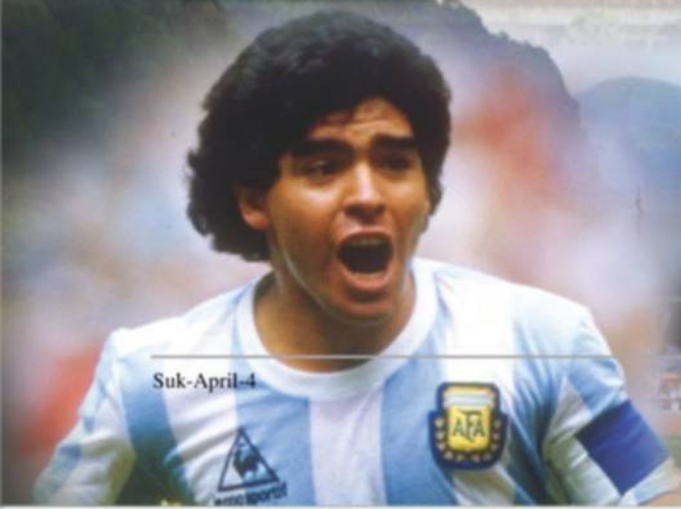

ঘড়ি রহস্য

গল্প ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ● চিত্রনাট্য ও ছবি ঃ জুরান নাথ

(গত সংখ্যার পর)

চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু কিছুই চুরি যায়নি।
আচ্ছা!
আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গতকাল রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি—
???
কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা-রাত্রি আর ঘুম হয়নি।
!!!
ঘর্-র্-র্-
আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?
নাহ। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। আর এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা সারাক্ষন আমার হাতে বাঁধা থাকে। এটা চুরি হয়নি।
আপনার দাদার নাম কী?
আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।
তিনি বেঁচে নেই?

আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বহু বছর দাদার সাথে যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম—
হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। ছুটে এলাম কলকাতায়।
তারপর?
হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন—
দাদা!
পানু! টাইম ইজ..... মানি। কথাটা..... মনে রাখিস।
ব্যাস! ওই শেষ কথা।
কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?
তারপর বদলি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। দাদার সঙ্গে মেস ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমায় একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।
ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

মজার পাতা

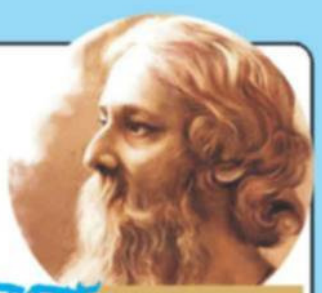

নতুন শব্দমালা

সংখ্যা নিয়ে মজা আর মজা

■+■ = ■

এক আর দুই যোগ করলে তিন হয়।

আবার ৪,৫,৬ যোগ করলে যোগফল যা হবে, ক্রমিক সংখ্যা ৭,৮-এর যোগফলও একই।

মজার ব্যাপার হলো তুমি এভাবে সংখ্যা দিয়ে যত বড় প্যাটার্ন-ই তৈরি কর না কেনো অদ্ভুতভাবে মিলতে থাকবে।

১+২ = ৩

৪+৫+৬ = ৭+৮

৯+১০+১১+১২ = ১৩+১৪+১৫

১৬+১৭+১৮+১৯+২০ = ২১+২২+২৩+২৪

এবার তুমি নিজে কর আর বন্ধুকে শেয়ার কর!

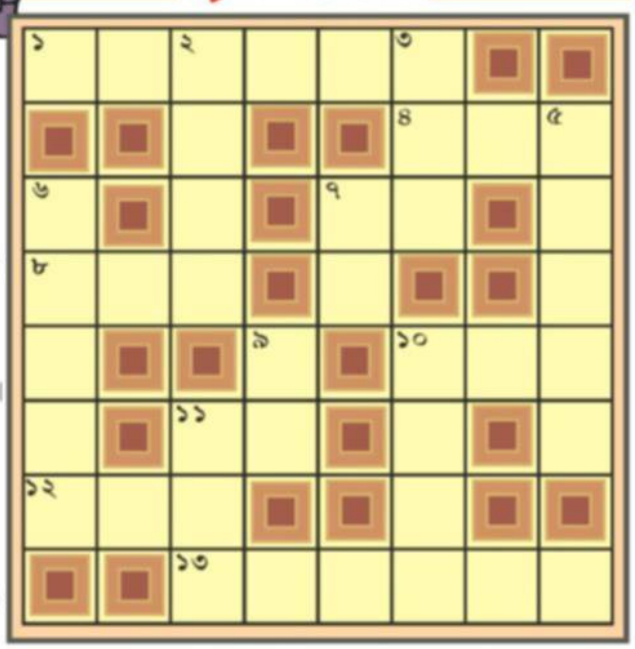

● ৩৪ একটা মজার সংখ্যা

৫০ থেকে ১০০-র মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা ধর। (ধরলাম ৭৭) সেই সংখ্যার সঙ্গে ৬৬ যোগ কর। এবার যোগফল (৭৭+৬৬= ১৪৩) যা এল তার শেষ সংখ্যা দুটি (৪৩), প্রথমে যে সংখ্যাটা ধরেছিলে তার থেকে বিয়োগ দাও (৭৭— ৪৩ = ৩৪)। দেখো ৩৪ হাজির।

●●

বুদ্ধি করে পাঁচটা ৩ দিয়ে ৩১ সংখ্যাটি গড়তে পারবে কি?

উত্তর

৬ক ৫ঘ ৪গ ৩ঙ ২খ ১চ

৩১ = ৩/৩ + ৩ + ৩^৩

(পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে)

[এটি তৈরি করেছেন্ গৌরাঙ্গ বন, চাঁপাবনী-নিউদিঘা, পূর্ব মেদিনীপুর]

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১) 'শিশু'-কাব্যগ্রন্থে 'জননীর প্রতি অনুরাগ যুক্ত' কবিতা; ৪) 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন — অন্ধকার' (গীতাঞ্জলি); ৭) 'মানীর — করিব হাসি' (মানী); ৮) 'বাদল মেঘে — বাজে' (সংগীত); ১০) 'দেবতার গ্রাস'-এ মোক্ষদার দস্যু ছেলে; ১১) '— এসেছে বীরের ছাঁদে/ বিয়ের লগ্ন আটটা' (খাপছাড়া); ১২) 'মুসলমানীর গল্প'-এ হবির খাঁ-র আশ্রিতা নারী; ১৩) ছুটি হলে শিশু রোজ জলে যা ভাসাতে চায়।

উপর-নীচ ঃ ২) কবিগুরুর প্রকাশিত প্রথম কাব্যোপন্যাস; ৩) 'আমার গোধূলি — এল' (সংগীত); ৫) 'কথা'-কাব্যে যে কবিতায় গৌতম বুদ্ধ ভক্তদের অন্নদানের কথা বলেছিলেন; ৬) 'শিশু'-গ্রন্থে 'সমালোচনাকারী' কবিতা; ৭) '—, আমায় ছুটি দিতে বল্' (প্রশ্ন); ৯) 'আজকে আমার ছুটোছুটি/ লাগল না — ভালো' (ছুটির দিনে); ১০) 'মুকুট'-গল্প ও নাটকে ত্রিপুরার মহারাজ অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র; ১১) রবি ঠাকুরের পাখির নামে এক কাব্যগ্রন্থ।

মজাদার নতুন মজা

বলো তো কী

■ এক কথায় উত্তর চাই

■ এই রেখা দুটি বাঁকা না সোজা?

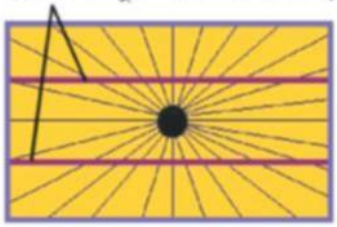

ডট যোগ করে ছবি বানাও

হুইল ঘুরিয়ে সঠিক ঠোঁট ম্যাচ করো

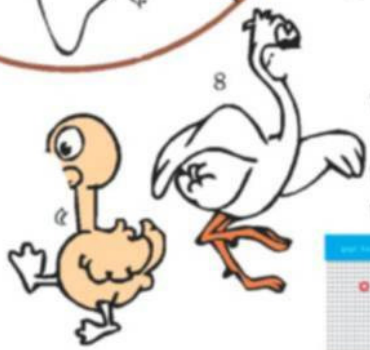

সময় ১ মিনিট

এই ধাঁধাতে C খুঁজে দাও চটপট

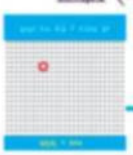

■ প্রণব হাজরা

লালটেম (পর্ব- ৩)

গল্প- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় • চিত্রনাট্য ও ছবি- অর্ক পৈতণ্ডী

ছোট্ট ইস্টিশনের পাশের ঝুপড়িতে লালটেমদের দশজনের সংসার। তার দাদু আছে। আছে আরো ছয় ভাই-বোন।

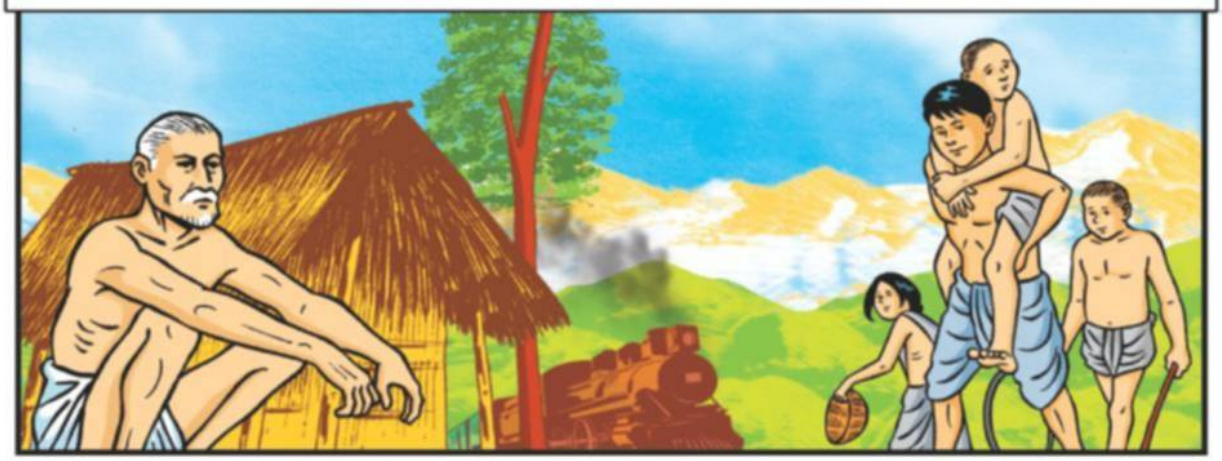

লালটেমদের তিনটে মোষের মধ্যে দুটো হল মেয়ে মোষ। তারা বছরের কোনো-না-কোনো সময় দুধ দেয়। লালটেমের বাবা দুধ,পেঁড়া,ঘি বেচে। মা ঘুঁটে বিক্রি করে। এই করে কোনোমতে তাদের সংসার চলে।

লালটেম আর তার ভাইয়েরা লেখাপড়া শেখেনি। দুধ,ঘি,পেঁড়া ছাড়া কোনো ভালো খাবার খায়নি। খাটো ধুতি-শাড়ি ছাড়া কখনো কিছু পরেনি। এমনকী একসঙ্গে একশো টাকাও কখনো দেখেনি।
এদিকে বুড়ো মোষটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাকি দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে ঘোর দুর্দিন।

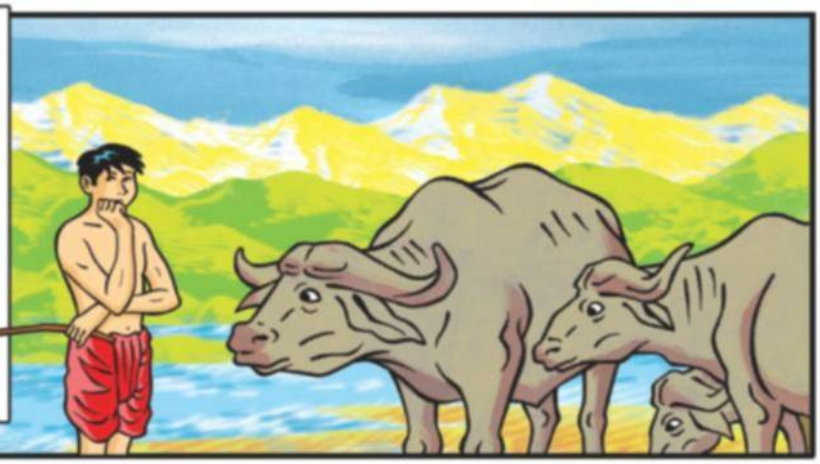

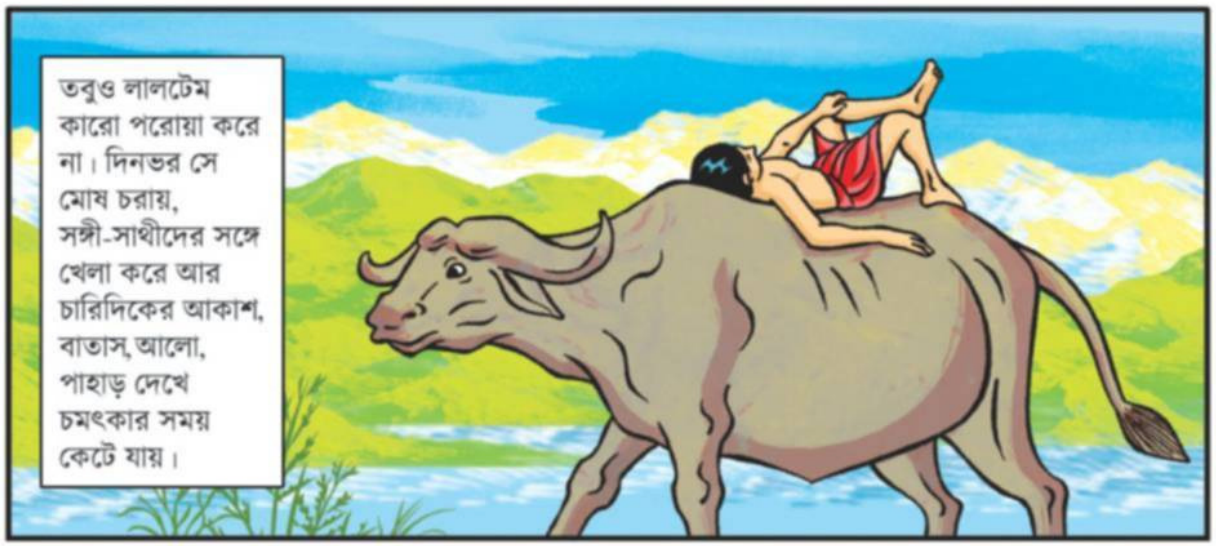
তবুও লালটেম কারো পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলা করে আর চারিদিকের আকাশ, বাতাস, আলো, পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটা লোক ওপার থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার গায়ে ময়লা চাদর, কাঁধে একটা মস্ত পুঁটলি। লালটেম আর তার সাথীরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল।

ওপারের জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গন্ডার আছে। সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও যায় দল বেঁধে। সঙ্গে কুড়ুল থাকে, তির-ধনুক থাকে।
লোকটা জল থেকে উঠেই পোঁটলাটা হাতে নিয়ে একগাল হেসে বলল...
কি খোকারা, একটা জিনিস দেখবে নাকি?
হ্যাঁ-অ্যা-

বিশ্বকাপেও এবার প্রযুক্তি

অগ্নি সান্যাল

বিশ্বক্রিকেট এখন অনেকটাই টেকনোলজি কেন্দ্রিক। নো বল, রান আউট, স্ট্যাম্পিং, দুই প্রতিপক্ষ দলের রিভিউ চাওয়ায় খেলার গতি অনেকটাই শ্লথ মনে হয় ইদানীংকালে। এতদিন ফুটবলে এই টেকনোলজির ব্যাপারটি ছিল না। কিন্তু এবার বিশ্ব ফুটবলেও ফিফার সভাপতি ইনফান্তিনোর হাত ধরে চলে এল প্রযুক্তি।

রাশিয়া বিশ্বকাপে ব্যবহৃত হবে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিজ টেকনোলজি। ১৬ মার্চ ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৮ বিশ্বকাপে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, 'আমাদের সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। ভিএআর প্রযুক্তি চালুর মাধ্যমে আমরা রেফারিদের হাতিয়ার দিতে চেয়েছি, যাতে তাঁরা আরও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সফল প্রমাণিত হয়েছে। তাই ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে ভিএআর পদ্ধতির সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ফুটবলের আইনপ্রণয়নকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) ৩ মার্চ ভিএআর ব্যবহারের বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়ায় আগামী জুন-জুলাইয়ের বিশ্বকাপে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তারা ছেড়ে দিয়েছিল ফিফা'র ওপরেই। ১৬ মার্চ টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। আইএফএবি জানিয়েছে, ম্যাচে কেবল চারটি পরিস্থিতিতে ভিএআর প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যাবে। সেগুলি হল—গোল, পেনাল্টি ও সরাসরি লাল কার্ড এবং ভুল করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে ভিএআর প্রযুক্তি প্রথমবার ব্যবহৃত হয়েছিল। চলতি মরশুমে জার্মানি ও ইতালির ঘরোয়া ফুটবলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্পেনের লা লিগায় এবং ফ্রান্সের লিগ ওয়ানে আগামী মরশুমে এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হবে।

আইএসএলের সেরা খেলোয়াড় সুনীল ছেত্রী

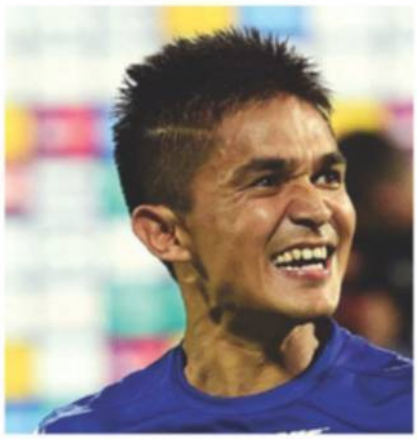

বেঙ্গালুরু এফসি'র রক্ষণ ও গোল- কিপিংয়ে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আইএসএলে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হল চেন্নাইয়ান এফসি। ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে হারিয়ে দেয় বেঙ্গালুরু এফ সি'কে। ২০১৫ সালের পর দ্বিতীয়বার আইএসএলে সেরা দক্ষিণের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দল। সবমিলিয়ে দু'বার সেরা হয়ে এটিকে'কে ছুঁয়ে ফেলল চেন্নাই।

১৭ মার্চ অলরাউন্ড এবিলিটি নিয়ে খেলে ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিলেন চেন্নাইয়ের স্টপার মেইলসন আলভেজ। ফলে সুনীল ছেত্রীদের প্রথম আইএসএল জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। সেদিন কান্তিরাভা স্টেডিয়ামের দর্শকপূর্ণ গ্যালারিতে 'নীল' উচ্ছ্বাসের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল সুনীল ছেত্রীর গোল। কিন্তু পরবর্তী লগ্নে মেইলসন-নেলসনরা জ্বলে ওঠেন। তাঁদের যোগ্য সঙ্গত দেন করণজিৎ সিং এবং জেজে।

তবে সেদিন ম্যাচের শেষে বিএফসি'র গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু প্রতিপক্ষকে কোনও কৃতিত্ব দিতে চাননি। তিনি সরাসরি বলে দেন, 'আমরা দুই পর্বের পর ৪০ পয়েন্ট পেয়েছি। চেন্নাই পেয়েছে মাত্র ৩২ পয়েন্ট। তাই আমরাই চ্যাম্পিয়ন। নক আউট-প্লে অফ এগুলি কোনও নিয়মই নয়।' গুরপ্রীতের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ কোনও দেশেই দুই পর্বের লিগের পর এমন অদ্ভুত নক আউট পর্ব হয় না। এমনকী আই লিগেও এমন নিয়ম নেই। গুরপ্রীত সিং সান্ধু তাই জ্বলন্ত ইস্যু তুলে ধরছেন। তাঁকে সরাসরি সমর্থন করেননি বেঙ্গালুরুর কোচ আলবার্ট রোকা। তবে স্প্যানিশ কোচ বলেন, 'হোম অ্যাওয়ে দুই পর্বের লিগের শেষে রানার্স চেন্নাইয়ানের থেকে আমাদের আট পয়েন্ট বেশি ছিল। সেমিফাইনালেও আমরা দাপট দেখিয়েছিলাম। কিন্তু ফাইনালে এগিয়ে গিয়েও জিততে পারিনি। আমাদের উপর ন্যায় হল কিনা তা আপনারাই বলুন।' চেন্নাইয়ের কোচ গ্রেগরি জানিয়েছেন, 'ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় ডিভিশনে এই রকমের নিয়ম আছে। এতে অন্যায় কিছু নেই।'

এদিকে আইএসএলের সেরা খেলোয়াড় হলেন সুনীল ছেত্রী। তিনি পেয়েছেন গোল্ডেন বুট। তবে সুনীল জানিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন হতে না পারার জন্য এই পুরস্কার পেয়ে তিনি আনন্দিত নন। সুনীল এখন জীবনের দুরন্ত ফর্মে আছেন। বেঙ্গালুরুতে গিয়ে খেলা আরও খুলেছে। সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন [illegible]য়ার কোরো (১৮)। তারপর আছেন বিএফসি'র মিকু (১৫) এবং সুনীল ছেত্রী (১৪)। টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন সুব্রত পাল। তিনি জামসেদপুর এফ সি'র হয়ে ১৮টি ম্যাচেই মাঠে নেমেছিলেন। শেষ ম্যাচে ৯ মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। ডোপ কেলেঙ্কারিতে যুক্ত সুব্রত পাল জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। তবে আইএসএলের সেরা গোলরক্ষক হয়ে তিনি হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। সেরা তরুণ ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন লালরেমলুথারা।

জুনে বেঙ্গালুরুতে ভারত-আফগান টেস্ট

আফগানিস্তান তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলবে জুন মাসে। বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিরুদ্ধে ওই ঐতিহাসিক টেস্টটি হবে ১৪-১৮ জুন।

ভারতের বেশিরভাগ শহরেই জুন মাসে বৃষ্টি হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বোর্ডকর্তারা বেঙ্গালুরুকে বেছে নিয়েছেন। জুনে বেঙ্গালুরুতে সেইভাবে বৃষ্টি হয় না। তবে এই ঐতিহাসিক টেস্টটি হচ্ছে রাশিয়া বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার মুখে। অস্থায়ী বোর্ড সচিব অমিতাভ চৌধুরী জানিয়েছেন, 'দুই বোর্ডের কর্তারা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জুন ২০১৭-তে ওরা টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে। কিন্তু গত এক বছরে কোনও প্রতিপক্ষ পায়নি। তাই আমরা সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলাম।' উল্লেখ্য বিশ্বের ১১ এবং ১২ নম্বর টেস্ট-খেলিয়ে দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে আফগানিস্তান এবং আয়ারল্যান্ড। আফগানিস্তান এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত। তাই এর মধ্যে আফগানরা গ্রেটার নয়ডায় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে। আই পি এলে খেলার সূত্রে দুই আফগান খেলোয়াড় রশিদ খান এবং মহম্মদ নবি এখন আন্তর্জাতিক মহলে প্রতিষ্ঠিত নাম। এবারের আই পি এলের জন্য ১৩ জন আফগান ক্রিকেটারকে নিলামে তোলা হয়েছিল।

বিশ্ব ফুটবলের নতুন তারকা ফিলিপে কুটিনহো

প্রায় ১৪২ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে অ্যানফিল্ড থেকে ন্যু ক্যাম্পে এলেন ২৫ বছর বয়সী তারকা মিডফিল্ডার ফিলিপে কুটিনহো।

তাঁর সঙ্গে সাড়ে পাঁচ বছরের চুক্তি করা হয়েছে। গত ৪ জানুয়ারি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে হাজির করানো হয় বার্সেলোনার তরফ থেকে। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউ জানিয়েছেন, 'ফিলিপে কুটিনহোকে পেয়ে আমাদের দল আরও শক্তিশালী হবে। গত বছরের মাঝামাঝি থেকেই আমরা ওকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছিলাম। তখন না পেলেও নতুন বছরে লিভারপুল ওকে ছাড়তে বাধ্য হয়। আমরা জানতাম, কুটিনহো বার্সেলোনার জার্সি গায়ে চাপাতে কতটা উদগ্রীব হয়ে আছে। আশা করব, নতুন ক্লাবে ও চূড়ান্ত সফল হবে। বিশ্ব ফুটবলের নতুন তারকা ফিলিপে কুটিনহো।'

সেদিন বার্সেলোনা বিমানবন্দরে ফিলিপে কুটিনহোকে স্বাগত জানিয়েছিলেন লুই সুয়ারেজ। সেদিন ভিডিও বার্তায় ব্রাজিলিয়ান তারকাটি সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'বার্সেলোনায় খেলার স্বপ্ন ছিল। যা এতদিনে সফল হল।' কুটিনহোর বক্তব্য, 'জেরার্ড পিকে-সের্গিও বুস্কেতসরা আমার আদর্শ। এছাড়া মেসি-ইনিয়েস্তাদের পাশে খেলতে পারলে অনেক কিছু শিখতে পারব। প্রয়োজন বার্সেলোনার সমর্থকদের সহযোগিতা।'

লিভারপুলে লুই সুয়ারেজকে সহ- ফুটবলার হিসেবে পেয়েছিলেন কুটিনহো। দু'জনের মধ্যে এখনও বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট। প্রাক্তন সহযোদ্ধাকে পাশে পেয়ে সুয়ারেজ বলেছেন, 'ও কতটা বিপজ্জনক ফুটবলার তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। লিভারপুলে ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স মেলে ধরেছে ও। কুটিনহোকে পাওয়ায় বার্সার আক্রমণভাগ আরও সচল হবে।'

ট্রান্সফারের ইতিহাসে নেইমার এবং কিলিয়ান এমবাপের পরেই থাকবেন ফিলিপে কুটিনহো।

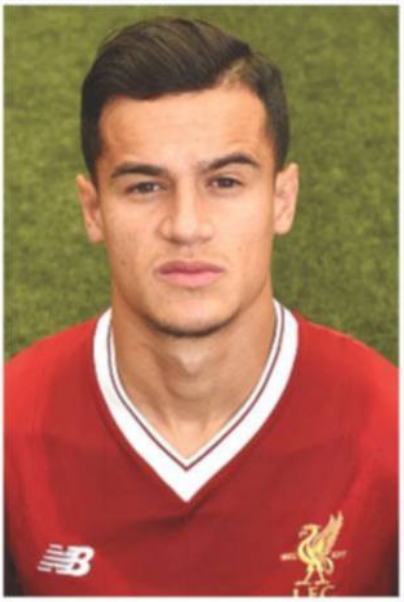

এই প্রসঙ্গে বার্সেলোনার কোচ আর্নেস্তো ভালভার্দের বক্তব্য, 'নেইমার চলে যাওয়ার পর আমাদের লক্ষ্য ছিল ওর পরিবর্ত হিসেবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে নেওয়া। কুটিনহো আসায় সেই অভাব অনেকটাই পূরণ হল।'

এক নজরে

জিমন্যাস্টিকসে উঠে আসছেন দুই প্রণতি ও মেঘনা

২০১৪ সালের কমনওয়েলথ গেমসে পদকজয়ী ভারতীয় মহিলা জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার এবারের গোল্ড কোস্ট গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। দিল্লিতে আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসের ট্রায়াল থেকে ইতিমধ্যেই দীপা কর্মকার নাম তুলে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী। দীপা চার বছর আগে কমনওয়েলথ গেমসে পদক পেয়েছিলেন। ২০১৫ সালে এশিয়ান জিমন্যাস্টিকসে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। তবে ২০১৬ সালের রিও ওলিম্পিকসে .০২১ পয়েন্টের জন্য চতুর্থ হন তিনি। দীপা কর্মকারই প্রথম জিমন্যাস্ট, যিনি ওলিম্পিকসে মহিলাদের জিমন্যাস্টিকসের ফাইনালে উঠেছিলেন।

রিও'র প্রতিযোগিতার পর ছয় মাস তিনি অনুশীলনেই নামেননি। ফ্লোরে ফিরে তিনি গত বছরের গোড়ায় চোট পান। তাঁর অ্যান্টিরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। গত এপ্রিলে তাঁর অপারেশন হয়। দীর্ঘ রি- হ্যাবের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী জানিয়েছেন, 'আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। ও গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসের জন্য ট্রায়ালে নামতেই পারত। তবে আগস্টে রয়েছে এশিয়ান গেমস। এই প্রতিযোগিতা অনেক বেশি শক্ত। আগামী কয়েক মাস দীপা এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি নেবে। রীতিমতো

পরিকল্পনা করেই এই সিদ্ধান্ত। কমনওয়েলথ গেমসের ট্রায়ালে না নামাটা কোনও মতেই আমাদের কাছে ধাক্কা নয়।'

দীপা কর্মকারকে সরিয়ে তাই ভারতীয় জিমন্যাস্টিকসে বড় মুখ হয়ে উঠছেন প্রণতি নায়েক, মেঘনা রেড্ডি, প্রণতি দাসরা। দুই প্রণতি এবং ভারতীয় জিমন্যাস্টিকসের নতুন বিস্ময় মেঘনা রেড্ডি অবশ্য রিদিমিক জিমন্যাস্টিকসে আছেন। তাঁরা দীপার মতো ভল্ট ইভেন্ট দেন না। রিদিমিক

প্রণতি নায়েক

জিমন্যাস্টিকসের চারটি বিভাগ রিবন, লুপ, বল এবং ক্লাবস। মেঘনা চারটি ইভেন্টেই দুরন্ত। কমনওয়েলথ গেমসের ট্রায়ালে ৫২ পয়েন্ট পেয়েছেন। তিনি গ্রিসে অনুশীলন করেন। আপাতত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের টপ স্কিমে

প্রণতি দাস

নেই। মাসে দুই লাখ খরচ তাঁর পরিবারই দেন। রিও ওলিম্পিকসে রিদিমিক জিমন্যাস্টিকসে নেমেছিলেন গ্রিসের ভানাজুয়েলরা। তাঁর কাছেই গ্রিসে ট্রেনিং নিয়ে মেঘনা ছাপিয়ে যাচ্ছেন প্রণতি নায়েক, প্রণতি দাসকে। বাংলার দুই প্রণতিই কমনওয়েলথ গেমসে যাচ্ছেন।

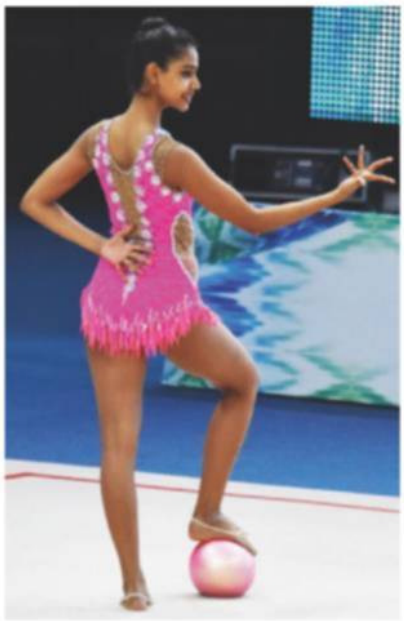

মেঘনা রেড্ডি

কুস্তিতে নজরকাড়া সাফল্য

নভজ্যোৎ কাউরের

এশিয়ান কুস্তিতে চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে সোনা এনে দিয়েছেন নভজ্যোৎ কাউর। মেয়েদের ৬৫ কেজি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পাঞ্জাবের ২৮ বছর বয়সী এই কুস্তিগির। ফাইনালে তিনি হারান কোরিয়ার হ্যানবিন লি'কে। কিরঘিজস্তানের বিশকেকে ১৬ মার্চ সোনা জয়ের পথে দারুণ দাপট দেখান নভজ্যোৎ। তাঁর দৃঢ়তা ও সংকল্পের জন্য চলতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার খরা কাটিয়ে ওঠে ভারতও। নভজ্যোতের কুস্তি জীবনেও এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক সোনা। ২০১৪ গ্লসগো কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। তার আগে ২০১১ ও ২০১৩ এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে যথাক্রমে ব্রোঞ্জ এবং রুপো জিতেছিলেন নভজ্যোৎ। উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবার সাফল্যের সোনালি আলো ছড়ালেন পাঞ্জাবের খালসা স্কুল স্পোর্টস ক্লাব থেকে উঠে আসা মহিলা কুস্তিগিরটি।

স্বপ্না বর্মনের স্বীকৃতি

জলপাইগুড়ির মেয়ে স্বপ্না বর্মন কমনওয়েলথ গেমসে যাচ্ছেন। স্বপ্না বর্মন জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে এসেছেন। সুস্মিতা সিংহ রায়কে টপকে তিনিই এখন বাংলার সেরা অ্যাথলিট।

হেপ্টাথলেনে তাঁর আশেপাশে কেউ নেই। জলপাইগুড়ির গ্রাম থেকে তুলে এনে তাঁকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দেওয়ায় তাঁর কোচ সুবাস সরকারকে ক্রীড়াগুরু সম্মান দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্বপ্না এখন সাইয়ে অনুশীলন করছেন। কলকাতায় এখন সুবাস স্বপ্নার মেন্টরের ভূমিকায়। গোলকোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে ভালো ফলের অপেক্ষায় তিনি।

শতাধিক গল্প, দুর্লভ ইলাস্ট্রেশন
বাংলায় প্রথম কোষগ্রন্থ
'শিশুভারতী'-র বিষয়ভিত্তিক সংকলন

গল্প ও কাহিনী ১৮০ টাকা
বিশ্ব সাহিত্য ১৭০ টাকা
অমর জীবন ১৩০ টাকা

সংগ্রহে রাখার মতো বই

দ্য লেজেন্ড অফ অগ্নিযুগ
২০০ টাকা

বিজ্ঞান থেকে ভূত
হাসি থেকে কান্না
নিয়ম যখন ভাঙে
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
দাম ১৫০ টাকা

ছোটদের সম্পূর্ণ রঙিন এক ঝলমলে জগৎ
দেশবিদেশের রূপকথা এবং উপকথা
১০০ টাকা
বিষ্ণুপুরাণ ৮০ টাকা
জাতকের গল্প ১২৫ টাকা

পাবেন: দেব লাইব্রেরি, দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর, মলয় প্রকাশনী, আদিনাথ ব্রাদার্স

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
৯৩এ লেনিন সরণি (মৌলালি)
কলকাতা ৭০০ ০১৩
ফোন : ২২৬৫-৫২৬৫/৬০৬১
২২২৭ ২৩৩৬

বক্সিং থেকে শ্যুটিংয়ে এসে মানু ভাকের চমক

আইএসএসএফ বিশ্বকাপ শ্যুটিংয়ে সাড়া জাগানো ১৬ বছরের মহিলা শ্যুটার মানু ভাকের ১০ মার্চ ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের টিম ইভেন্টে দ্বিতীয় সোনাটি জিতলেন ওমপ্রকাশের সঙ্গে জুটি বেঁধে। মেক্সিকোর গুয়াদালজারায় আয়োজিত আইএসএসএফ বিশ্বকাপ শ্যুটিংয়ে এই অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়ে উচ্ছ্বসিত মানু। বলেছেন, 'এটা এক কথায় অবিশ্বাস্য! আমি এখানে আসার আগে কখনও ভাবিনি দুটি সোনা পাব। এটা সিনিয়র বিশ্বকাপ। আমার বয়স মাত্র ১৬ বছর। মাত্র দু'বছর আগে শ্যুটিং শুরু করেছি। তাই ব্যক্তিগত ইভেন্টের আগে একটু নার্ভাস ছিলাম। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ১৭ ও ১৯তম শটে আমি স্কোর করেছিলাম যথাক্রমে ৮.৪ ও ৮.১। এটা স্নায়ুর চাপে ভোগার জন্যই হয়েছে। কিন্তু শেষ শটে ১০.৬ স্কোর করে আমি বাজিমাত করে দিই। এর আগে বক্সিং লড়তাম। মার্শাল আর্টে মন দিয়েছিলাম। এখন আমার লক্ষ্য গোল্ড কোস্টে কমনওয়েলথ গেমস শ্যুটিংয়ে সোনা জেতা। এছাড়া রয়েছে জুনিয়র বিশ্বকাপ। এটাই আমার প্রথম সিনিয়র বিশ্বকাপ। মেক্সিকোর এই স্মৃতি আমি জীবনে ভুলতে পারব না। দেশকে আরও পদক উপহার দিতে চাই। আমি এখন স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ি। তাই পড়াশোনাও করতে হবে।' মানু ২০১৮ বুয়েনস এয়ার্স ইউথ ওলিম্পিক গেমসে কোটার স্থান নিশ্চিত করেছেন। উল্লেখ্য, গত জাতীয় শ্যুটিংয়ে মানু ভেঙে দিয়েছিলেন হিনা সিধুর জাতীয় রেকর্ড। এদিন ভারতের হয়ে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের টিম ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের মেহুলি ঘোষ ও দীপক কুমার।

এই প্রতিযোগিতায় মিরাট থেকে উঠে আসা শ্যুটার রিজভি ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড গড়েন ২৪২.৩ পয়েন্ট স্কোর করে। তিনি হারান একদা ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান রেইটজকে (২৩৯.৭ পয়েন্ট)। ভারতের আর এক পিস্তল শ্যুটার জিতু রাই ২১৯ পয়েন্ট স্কোর করে জেতেন ব্রোঞ্জ। সিনিয়র বিশ্বকাপে অভিষেকেই মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে মেহুলি ওয়ার্ল্ড জুনিয়র রেকর্ড গড়ে (২২৮.৪ পয়েন্ট) ব্রোঞ্জ জিতে দারুণ চমক দিলেন। বছরের প্রথম বিশ্বকাপ শ্যুটিংয়ে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছলেন ভারতের তিন শ্যুটার। ভারতের আর এক শ্যুটার ওমপ্রকাশ মিথারভাল ১৯৮.৪ পয়েন্ট স্কোর করে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন।

মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টের একেবারে শুরু থেকেই পদক জয়ের দাবিদার ছিলেন মেহুলি ও অঞ্জুম। শেষ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ২০৮.৬ স্কোর করে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন অঞ্জুম। মেহুলির সাফল্যে বাংলা শ্যুটিং বিশ্বস্তরের প্রতিযোগিতায় আরও একবার উজ্জ্বল হল।

উঠছে যারা

বীরু বসু

বিদিশা গায়েন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রামের মেয়ে হলেও খেলাধুলোর নিরিখে কলকাতা সাই হোস্টেল হচ্ছে মেয়েটির আসল ঠিকানা। মা বন্দনা গায়েন প্রাক্তন জাতীয় জিমন্যাস্ট। তাঁরই মেয়ে বিদিশা গায়েন জুনিয়ার লেভেলে বাংলার সেরা জিমন্যাস্টের শিরোপা অর্জন করেছে। সাই-এর কোচ জয়প্রকাশ চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে বিদিশা বেশ কটি ন্যাশনালে প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন বিভাগে প্রচুর স্বর্ণপদক সংগ্রহ করেছে। অল ইন্ডিয়া স্কুল গেমসে ছ'টি বিভাগে অংশ গ্রহণ করে পাঁচটিতে স্বর্ণপদক এবং একটিতে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে বিদিশা।

দিল্লিতে খেলো ইন্ডিয়া জাতীয় স্কুল গেমসে বিভিন্ন বিভাগে খেলতে নেমে অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফ্লোর, বিম, আনইভনবারে পেয়েছে স্বর্ণপদক এবং ভলটিং হর্সে পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। এছাড়াও বিদিশা বছর দুই আগে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিনিধিত্ব করেছিল ভারতীয় স্কুল দলের হয়ে। পরিসংখ্যানগতভাবে বিচার করে দেখা যাচ্ছে বাংলার জিমন্যাস্টিক্সে বিদিশার উঠে আসার গ্রাফ লাইনটা অনেক ভালো। সিনিয়ার ন্যাশনালে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাই বিদিশার এখন লক্ষ্য। সেভাবেই তাকে তৈরি করছেন বিদিশার কোচ জয়প্রকাশ চক্রবর্তী।

শিপ্রা সরকার

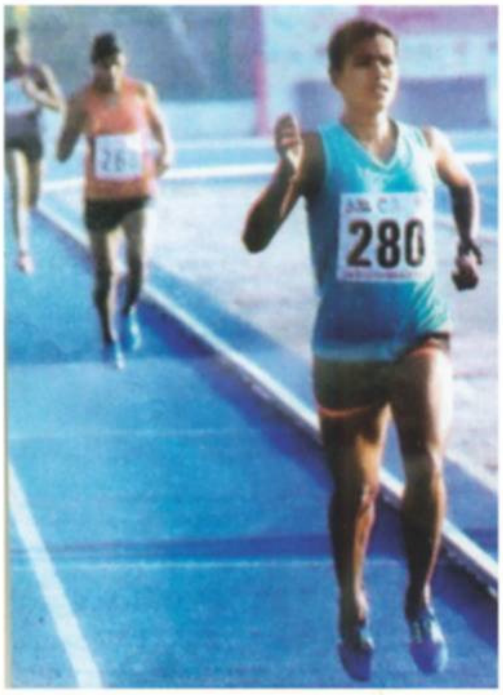

রায়গঞ্জ স্টেশন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে শেরপুর গ্রাম। সেই গ্রামের মেয়েকে বড় অ্যাথলিট গড়বেন বলে তুলে এনেছিলেন সেকালের কোচ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। প্র্যাকটিস করাতে পারলে উন্নতি করবে এই আশায় নিজের গড়া রায়গঞ্জ উদয়পুর কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দেন। কিন্তু প্রতিভা আছে বুঝতে পেরে নিজের হাতে মেয়েটিকে না রেখে সরাসরি কলকাতার সাই কেন্দ্রের নামী কোচ কল্যাণ চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণবাবু গত হয়েছেন, কিন্তু সাই-এ আসার পরেই শেরপুর গ্রামের মেয়ে শিপ্রা সরকার উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পেয়ে এখন দেশের প্রথম শ্রেণির অ্যাথলিট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ন্যাশনাল লেভেলে ৮০০ এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রচুর পদক সংগ্রহ করেছে। সম্প্রতি পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স মিটে—৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্যপদক লাভ করেছে বাংলার এই মেয়ে। গত বছর ওপেন ন্যাশনালে ৮০০ মিটার দৌড়ে রুপো পেয়েছিল শিপ্রা। এছাড়া অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে ৮০০ এবং ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রতিনিধিত্ব করে রুপোর পদক জিতেছিল অভাবী ঘরের মেয়েটি। বাবা প্রফুল্ল সরকার রায়গঞ্জ বাজারের সবজি বিক্রেতা হলেও মেয়ে শিপ্রা বড় অ্যাথলিট হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাক, বাবা হয়ে মেয়ের কাছ থেকে সেটুকুই আশা করেন তিনি।

সোনার বিছে

সাগরিকা রায়

ছবি : রুদ্রনীল ঘোষ

নব হালদারের অনেক টাকা। তার বিঘের পর বিঘে জমি। সেই জমির কোথাও ধান চাষ হচ্ছে, কোথাও সবজি, কোথাও চার বিঘে জমিতে আমবাগান তো কোথাও রসালো কাঁঠালের বাগান। নব ভারী ভালো লোক। সে কিনা বড়লোক, তাই ওর বাড়িতে গরিব-দুঃখী খেতে পায়। ভিখিরি ভিক্ষে পায়। আর গরিব আত্মীয়স্বজন আশ্রয় পায়। নবর বউ কলাবতী ভোরবেলা স্নান করে মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপরে খেতে বসে। জমির আম কলা কাঁঠাল কিছুই এখনও পাকেনি। কলাবতী কালো নোনিয়ার চালের ফেনাভাতে দুটো আলু ফেলে বাড়িতে তৈরি ঘি দিয়ে বেশ করে মেখে খায়। ভারী শান্তশিষ্ট কলাবতী ঘুমোতে বেজায় ভালোবাসে। খাওয়া হল কি, কলাবতী মনখুশিকে ডাক দেবে, ও মনখুশি, সিঁদুরে আমগাছের তলে একটা খেজুরে চাটাই পেতে দে দেখি। অমনি মনখুশি ছুট্টে গিয়ে শালুকপুরের বোনাবুড়োর হাতের রঙচঙে খেজুর পাতার মাদুর এনে পেতে দেয়। আর কলাবতীও ধপাস দুম ঘুম! ফরফর করে নাক ডাকতে শুরু করে দেয়। আজ সিঁদুরে আমগাছের তলে, কাল কাঁঠালের বাগানে গিয়ে ঘুমোনোটা অভ্যেস হয়ে গেছে কলাবতীর। নব হালদার অনেক বুঝিয়েছে। বলেছে, আগানে-বাগানে গিয়ে ঘুমোনো মোটেই ভালো নয়। গরম পড়িছে। এখন সাপখোপ বের হবে। তুমি ঘরে ঘুমোও গে কলাবতী। নাজুকপুর থেকে কেমন নকশি চাদর আনিছি। ওটা পেতে ঘুমোলে মনডা ভালো লাগবে। কিন্তু কলাবতীর অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা। সে আর ঘরে ঘুমোতে পারে না।

এমনি করেই চলছিল। একদিন হল কি নব হালদার গিয়েছে কমলাপুলির হাটে সবজির বাজার দেখতে।

সেখানে তার মতো আরও অনেক লোক এসেছে। তাদেরও বিঘে বিঘে জমি আছে। তারাও সবজির বাজার দেখতে এসেছে। কমলাপুলির হাট হল গে ভারী চনমনে হাট। কত কত রকমের লোক সেখানে কত কত জায়গা থেকে আসে! হাটে একটি লোক বেজায় মজার খেলা দেখাচ্ছিল। একটি রুপোর ছোট বাক্স থেকে সোনার তৈরি বিছে বের করে দেখাল। বিছেটা বাইরের বাতাস পেয়েই জ্যান্ত হয়ে গেল। সুড়সুড় করে হেঁটে বেড়াল এধার-ওধার। একবার হাঁচি দিল 'হুচুত'! ফের বাক্সে ঢুকিয়ে রেখে ঢাকাচাপা দিতেই সেটা ফের সোনার বিছে হয়ে গেল। দেখে-টেখে নব হালদারের বেজায় পছন্দ হয়ে গেল। সে ভাবল—বাঃ, ভারী মজার জিনিস তো! কলাবতী দেখলে না জানি কতই খুশি হবে! নিয়ে যাই বাড়িতে। শুনে সেই খেলা দেখানো লোকটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, একে দুধপদ্মর কচি পাতা খেতে দিতে হবে। সেই পাতা ভিজিয়ে রাখতে হবে চাঁদের আলোয়। একটি কথা মনে রেখো, বিছের গায়ে যেন দুপুরের গরম বাতাস না লাগে! আর নিতে চাও যদি তো হাজার সোনার টাকা দাও।

নব হালদারের কিনা অনেক টাকা, সে সোনার বিছেটা নিয়ে নিল। নিয়ে গাঙ পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলল। কলাবতী সেই বিছে পেয়ে যে কী খুশি হল, সে মোটে বলার না। সারাক্ষণ রুপোর বাক্স নিয়ে রাখে নিজের কাছে। নব হালদার বারবার বলেছে বিছেকে দুপুরের বাতাস লাগিও না কিন্তু। বলাবতী কখনই বিছেটাকে বাক্সের বাইরে বের করে না।

তো একদিন হল কি, নব হালদার গেছে নৌকো চেপে মামার বাড়ি কনকপুরে। সেখানে এক বুড়ি থাকে, যার বাগানে এক অদ্ভুত ধরনের ফল হয়। সে ফল খেলে রোগ-ব্যাধি সাতহাত দূরে পালিয়ে যায়। বুড়ি বেজায় রাগী কিনা, তাই সেই ফল খেতে কেউ পায় না। বুড়ির যদি কাউকে ভালো লাগে, তবেই তাকে ফল খেতে দেবে। নব হালদার কমলাপুলির হাট থেকে মনে করে বুড়ির জন্য ভিন দেশের পান নিয়ে এসেছে। শুনেছে বুড়ি নাকি পান খেতে ভারী ভালোবাসে। সে পান রসে ভরা। বুড়ি ভারী খিটখিটে। খড়ে ছাওয়া মেটে ঘরে বসে নারকেলের কুড়কুড়ে বড়া ভাজছিল। নবর থেকে পান নিয়েছে। কিন্তু ফলের কথা উঠতেই ভাগিয়ে দিল নবকে, এহনি এহান থেকে যাও দিনি। মোটে গরম করে দিওনি মাতা। শুনে নব মামাবাড়িতে গিয়ে ভাইদের থেকে বুদ্ধি নিল। ভাইরা বলে দিল, বুড়ি ওই ফল দেবে না। যদি তুমি তাকে আশ্চর্য কিছু দিতে না পারো। নব আর আশ্চর্য কোথায় পাবে? সে মন খারাপ করে ফিরে এল বাড়িতে। ভাবল, ফের একদিন যাবে কমলাপুলির হাটে। আশ্চর্য কিছু আনতে। ওখানে বড্ড আশ্চর্য পাওয়া যায়।

আস্তে আস্তে দিন যায়। কলাবতী একদিন দুপুরে কাঞ্চনমণি আমতলায় ঘুমোতে গিয়েছে। ঘুমোনোর আগে একবার সোনার বিছেটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হল। ভাবল, এই এট্টু দেখেই রেখে দেব। রুপোর বাক্স থেকে বিছে বের করে দেখতে দেখতে ফুরফুরে বাতাস এসে চোখে ঘুম ছড়িয়ে দিল। চোখ ঘুমে ভারী হয়ে গেল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানেই না! চোখের বা কি দোষ বলো। কতক্ষণ ধরে বিছে দেখবে ও? ডান চোখ বাঁ চোখকে বলল, আয়রে ভাই, ঘুমোতে যাই, শরীর ভারী হল। তখন বাঁ চোখ বলল, কলাবতী জেগে থাকুক, আমরা ঘুমোই চল। বলেই দুজনে ঘুমে ঢলে পড়েছে। তারা ঘুমোতেই কলাবতীও ঘুমিয়ে কাদার ঢ্যালা। আর সেই সোনার বিছে? তার কী হল? দুপুরের গরম বাতাসের হলকায় সে হয়ে গেছে জ্যান্ত। জ্যান্ত হয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়াল এদিক-ওদিক। তারপরে ক্লান্ত হতে তার পেল ঘুম। সে তখন বাক্সে ঢুকবে বলে বাক্স খুঁজে হয়রান আর হয়রান। গেল কোথায় বিছের বিছানা? বিছানা খুঁজতে খুঁজতে বিছে কলাবতীর মেঘের মতো চুল বেয়ে বেয়ে বেয়ে উঠে গেল মাথায়। সেখানে হাঁটতে গেলেই পা জড়িয়ে যায় চুলে। বিরক্ত বিছে নেমে আসতে গিয়ে আস্তে...আস্তে...কলাবতীর কানের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কলাবতী জানতেও পারেনি কী কাণ্ড হয়ে গেল।

With best Compliments from
RUPA FINANCE (INDIA)
Finance of
Car, Motor Cycle, Scooter, Land & Allied Items.
46/4773, Regharpura
Karol Bagh
New Delhi - 110 005

কানের ভেতরে গরম পেয়ে বিছে ঘুমিয়ে পড়ল। নব হালদার যখন বাড়ি ফিরেছে, কলাবতী কথা বলে না, খায় না, হাসে না! ওমা গো! কী হল গো কলাবতীর? মনখুশি কেঁদেকেটে একশা—সাঁঝ নামলি পরে চাড্ডি ক্ষীরের মোয়া খাবে বলিছিল। এক বালঠি দুধ মেরে ক্ষীর করিছি। ওম্মা, সে যে খাতিছে না! কতা কতিছে না!! সেই কান্নার শব্দে বাড়ির গরুগুলো দুধ দিল না আর। গাছের আমগুলো পাকি পাকি করছিল, তা তারাও থেমে গেল। মুখ শুকিয়ে চিমড়ে হল সবার। কিন্তু কলাবতী তবু খেল না। কথা বলল না। সারাক্ষণ মাথা চেপে ধরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে 'উফ স্মা, কী ব্যাতা, কী ব্যাতা, মরি গেলুম গো' ছাড়া অন্য কথা নেই।

নব হালদার চিন্তায় পড়ে গেল। দুমদুমি থেকে বদ্যি এল। সে ভারী নামকরা। তার ওষুধে বেজায় ভালো কাজ হয়। কলাবতী ওষুধ খেল। বদ্যি বলেছিল, সাতদিনে সাত ফোঁটা/এক ফোঁটা জলে/মুখে দিয়ে চোখ মেল/রোগ যাবে চলে। কলাবতী সবই করল। কিন্তু রোগ যেমনকে তেমন রইল। কী করে নব হালদার? দশ গঞ্জের দশ বদ্যি এসেও কলাবতীর রোগ সারাতে পারল না। কেউ বুঝতেই পারে না রোগটা কী? দেখে শুনে নবর পিসি মাথা নাড়ে, ভালো বুঝতিছি না নব। তোর বউরে বুঝি ভূতে ধরিছে। আগানে-বাগানে অরে শুতি বলিছে কেডা? একথা শুনে নব তো আর নেই! ভয়ে শরীরে মাঘের শীত। ঠকঠক কাঁপে সে, অ পিসি! হুপায় কী? হুপায় কী? পিসি ফিসফিস, উপায় নেইরে নব! অর ধারেকাছে যাসনি বাপ! তালি তোরিও ভূতে ধরপে। শুনিছি গাঙের ভূতের দল এদিকি চলি আসিছে।

নব হালদার কলাবতীর কাছেই যায় না।

দেব সাহিত্য কুটীর-এর
রামকৃষ্ণ সাহিত্য

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত
শ্রীম কথিত ২০০

নব যুগের দিশারী শ্রীশ্রী মা সারদা
২৫০ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ নানা ভাবনালোকে
স্বামী অচ্যুতানন্দ ১০০

সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১২০

ভারতের তীর্থে তীর্থে
(১ম ও ২য় খণ্ড)
স্বামী অচ্যুতানন্দ

১২০ ১২০

বারাণসী তীর্থে পথে পথে ঘাটে ঘাটে
স্বামী অচ্যুতানন্দ ১০০

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
০৩৩-২৩৫০৪২৯৪/৯৫/৭৮৮৭
Website: www.debsahityakutir.com
E-mail: dev_sahitya@rediffmail.com

দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে। মনখুশিকে ডেকে জানতে চায়, কলাবতীর খবর আছে? খায়? হাসে? কতা বলে? মনখুশি কেবল মাথা নাড়ে, নাগো, তার মাতায় বড় ব্যাতা। ওষুদ দাও দিনি।

সে আছে কোতায়? এহোনও কি আদারে-বাদাড়ে ঘোরে?

মনখুশি মাথা নাড়ে, আগের মতো আগানে-বাগানেই ঘোরে গো। ওষুদ দিও। ওষুদ না পেলি সে যে সারপে না!

নব ফের সেই বুড়ির কাছে কনকপুরে গেল। বুড়ি দেখাই করল না। নাকি সে নাতির বাড়ি গেছে মহেশখালিতে। কিন্তু গাছটা তো আছে। ফলও আছে। নব কি কলাবতীর জন্য একটি ফল পাবে না? বুড়ির বাড়িতে ঢোকার দরজাটা বুড়ি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বলে নব বুড়ির বাড়িতে ঢুকতে পারল না। বেচারা মন খারাপ করে বাতাস আকাশ গাছগাছালিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ির নিন্দে করে বাড়ি চলে এল। কলাবতীকে সারিয়ে তোলার আর পথ খুঁজে পেল না সে।

এদিকে কলাবতীর মাথার ভেতরে সে বিছে ঢুকে সংসার পেতে বসেছে। তার বাচ্চাকাচ্চা সারাদিন কেইমেই করে, ওমা, খিদে পেইচে, খিদে পেইচে। চাড্ডি খেতে দে দিনি। বিছে কী করে? মাথার ভেতরে তো দোকানপত্র নেইকো। সে পড়ে গেল মহা আতান্তরে। রেগেমেগে বাচ্চাদের বকাবকি করে। বাচ্চারা কান্নাকাটি করে। মাথার ভেতরে এত ঝামেলা কি সহ্য করা যায়? কলাবতী অস্থির হয়ে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। সে যে কী কাণ্ড তা মোটে বলার নয়। দেখেশুনে নব ভাবে—যাঃ, বউটা গেল পাগল হইয়ে! এই পাগলিরে এহন দ্যাহে কে কও দিনি!

বৈশাখ মাস পার হল। গরমে আরও ছটফট করে বিছেরা। তাদের ছটফটানিতে কলাবতীর ছটফটানি বেড়ে গেল। এমনি করে একসময় জষ্টি মাস এল। নব হালদারের আমবাগানের আম পেকে সুবাস ছড়াল। কাঁঠাল পেকে ফাটো ফাটো হল। এত এত কাঁঠাল হয়েছে, গাছের গোড়া অব্দি নেমেছে কাঁঠালের দলবল। কলাবতীর অতদিকে নজর নেই। সে কাঁঠাল খেতে কত ভালোবাসত, সে কথা ভুলেই গেছে বিছের কামড় খেতে খেতে। দুপুরের রোদের তাপে এটু ছায়া খুঁজে গিয়ে শুল কাঁঠাল গাছের গোড়ায় মাথা রেখে। তার মাথার চাপে কাঁঠাল ফেটে গেল। রস টুসটুসে কাঁঠালের কোষগুলো বাইরে বেরিয়ে এল। আর কী তার সুগন্ধ রে ভাই! সেই গন্ধে পাগল হয়ে গেল বিছে আর তার ছানাপোনা। হুড়পাড় লেগে গেল। হ্যাঁ ভাই, কিসের গন্ধ ভাই? কিসের গন্ধ আসতিছে? চল দেখি গে। বলে সব বিছে কানের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সরসর করে, ফরফর করে, হুড়হুড় করে, হাইমাই করে, খাই খাই করে বেরিয়ে এল কত্ত কত্ত বিছে! একটিও আর কানের ভেতরে রইল না। সব গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাঁঠাল খাবে বলে।

এদিকে কলাবতী? বিছেরা মাথায় নেইকো। মাথায় বিছের কামড় নেইকো। অ...নেকদিন পরে আরামের ঘুম ঘুমিয়ে যখন উঠে বসল, তখন সাঁঝ নামব নামব করছে। পাখিরা সব যার যার বাসায় ফিরে যাচ্ছে। সূর্যের রঙ লাল হয়ে গেছে। উঠে এলোচুল গুছিয়ে বিরাট হাই তুলেছে কলাবতী। তারপরে হাঁক পেড়েছে, ও মনখুশি, আমার ক্ষীরের মোয়া নে আয় দিনি। খিদে পেইচে। বিছেদের থেকে পেইচে বলতে শিখেছে কলাবতী। মনখুশি ছুটে এল। নব ছুটে এল। বাকি সব ছুটে ছুটে এল। কলাবতী ভালো হয়ে গেছে। আর ঝামেলা নেই।

এখন কলাবতী ফের আগের মতো খায়দায়। কিন্তু ভুলেও আগানে-বাগানে শোয় না। মনে মনে বোঝে আগান-বাগানেই ভূতে ধরেছিল। নব আশ্চর্য জিনিস বলে বিছেটাকে কত্ত খুঁজেছে। কিন্তু সোনার বিছে কোথায় যে গেল! বুড়ির থে সেই ফল আনাও হল না নব হালদারের। জানে না দুপুরের বাতাস পেয়ে বিছে মজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়ে গেছে কৌটোয় থাকতে!

কলাবতী ভালো হয়ে গেছে। সেদিন সেজেগুজে পুজো দিতে যাচ্ছিল। পায়ের নূপুর বাজছিল ঝুমঝুম। শুনে কাঁঠাল গাছে বসে থাকা বিছের বড় ছেলে ঘাড় তুলে কলাবতীকে দেখে বাতাসে গন্ধ শুঁকল, অ মা, বউডিরে ক্যামন য্যান চিনা চিনা লাগতিছে না? সোনা- রুপোর গন্ধ আসতিছে!

বিছের তখন খুব ঘুম পাচ্ছে। সে বিরক্ত হল, ঘুমো দিকি বাপ। সবদিকি নজর দিতি হবেনি। সোনা-রুপোর গন্ধ ভালো না!

বিছের ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

নিউ বেঙ্গল প্রেসের উল্লেখযোগ্য বই

সুশীল মুখোপাধ্যায়ের

রহস্যে ঘেরা পুরীর শ্রীজগন্নাথ

৬০.০০

(শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের কেন এরূপ রহস্যময় মূর্তি? কেনই বা বিশেষ এক জাতি গোষ্ঠী বিগ্রহের সেবক?...ত্রিমূর্তির পাশে চতুর্থ মূর্তি কার? এরূপ অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান আছে বইটিতে।)

বেদব্যস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিত

হরিবংশ ৩০০.০০

(ডঃ দীপক চন্দ্রের ভূমিকাসহ)

সম্পূর্ণ গদ্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী সম্বলিত শ্রীমদ্‌ভাগবত।

এই শক্তিশালী লেখকের আরেকটি বই

কালচক্র ২২৫.০০

বইটিতে আছে ১। কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন, ২। অশ্ব-থামা, ৩। কাশ্যপেয় এবং (মহা-ভারতীয় সমাজ জীবনের বিজ্ঞান- সম্মত তথ্য—এই তিনটি উপন্যাসে)

সুরুচিবালা রায়

নবদ্বীপ দীপশিখা বিষ্ণুপ্রিয়া

৬০.০০

(সমগ্র নারীজাতির গৌরব বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মত্যাগ ও তৎকালীন গৌড়ীয় সমাজ জীবনের তথ্যচিত্র।)

ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রমুখে

(১ম খণ্ড—৭ম খণ্ড)

সাতটি খণ্ডের দাম—৪৭০.০০ টাকা

অনিল ভৌমিক

- অদৃশ্য জলদস্যু ৬০.০০
- পোড়া বাড়ির রহস্য ৬০.০০
- একটি ঘরের রহস্য ৬০.০০
- তিনটি সেরা রহস্য উপন্যাস ১৫০.০০

শিশির কুমার মজুমদার

- মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ৬০.০০
- পাতালপুরী অভিযান ৬০.০০
- দুটি সেরা অ্যাডভেঞ্চার ১০০.০০

মানবেন্দ্র পাল

- বাপ্পার অ্যাডভেঞ্চার ৬০.০০

সংকর্ষণ রায়

- অষ্টভুজা রহস্য ২০.০০
- রক্ত প্রবাল ১০০.০০
- ইউরেনিয়াম রহস্য ৪০.০০

শতদল ভট্টাচার্য

- নিশুতি রাতের মহাত্মা ৬০.০০
- ভয় পেও না ৫০.০০

বেনেবউ

- উপলব্ধি ১০০.০০

(ভিন্ন স্বাদের তিনটি উপন্যাস)

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

- কামড় ৩০.০০
- জীবন দান ২৫.০০

সুরমা চন্দ

- আধুনিক রন্ধন প্রণালী ৬০.০০

বনফুল উপন্যাস সমগ্র

(১ম খণ্ড—৮ম খণ্ডের) ২৯০০.০০

বিদগ্ধজন দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত দুটি বই—

প্রফুল্ল রায়-এর

- **সরস উপন্যাস** ৩০০.০০
- **পাঁচটি বাছাই উপন্যাস** ২৭৫.০০

যশস্বী লেখকের কালজয়ী গল্প সংকলন—

- **শ্রেষ্ঠ গল্পে নটরাজন** ২৫০.০০

ড. পঞ্চানন ঘোষাল

- **একটি নির্মম হত্যা** ২৫.০০
- **একটি নারী হত্যা** ২৫.০০
- **অধস্তন পৃথিবী** ১০০.০০

সর্বজন স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ সংকলন আলোলিকা মুখোপাধ্যায়-এর

- আরোহণ ১৭৫০.০০

মিলন মুখোপাধ্যায়-এর

- **ওড়াউড়ি** ২২৫.০০

রবিদাস সাহারায় সম্পাদিত

পাঁচজন রসিকের গল্পের সংকলন

- **পাঁচ রসিকের পাঁচালি** ৭০.০০
- **ধ্রুপদী কৌতুক** ৩৫.০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড □ ৬৮, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০৯

ডাক ও হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে □ দূরভাষ— ২২৪১-২২৪৩

বিষয়বস্তু ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামন্ত্রে দীক্ষিতা কোনো কন্যার সমাজসেবা

জয়ন্তী সেনগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

নদী

ছবি ঃ কল্পনীল ঘোষ

সৌরীশ মিশ্র

সন্ধ্যার মুখে একমাত্র মেয়ে নদীর ফোনটা পেয়ে বড় খুশি হয়েছিলেন বীরেনবাবু। কিন্তু সেই খুশি বুদবুদের মতো ক্ষণস্থায়ী হবে বুঝতে পারেননি তিনি।

বীরেনবাবু রঘুবীরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আগামী জুনে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। স্ত্রী অলকাদেবী গত হয়েছেন বছর দুয়েক আগে। তাঁদের একমাত্র সন্তান নদী এম. এ পাশ করে শিক্ষকতা করছে ওড়িশার পুরীতে একটি ইংরিজি মাধ্যম স্কুলে বছরখানেক হল।

বীরেনবাবু এই রঘুবীরপুরের বাড়িতে তাই এখন একাই থাকেন। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন কখন পুজোর ছুটি, গরমের ছুটি বা বড়দিনের ছুটিতে মেয়ে আসবে তাঁর কাছে।

পৌষ মাস পড়েছে। সামনেই ক্রিসমাস, নিউ-ইয়ার উপলক্ষে বেশ ক'দিন টানা ছুটি। বীরেনবাবু তাই গত কয়েকদিন ধরে অপেক্ষায় ছিলেন কখন মেয়ে ফোন করে বলবে—বাবা, আমি আসছি বাড়ি।

সেই মতোই আজ সন্ধ্যার সময় ল্যান্ডলাইন-এর ওপার থেকে মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বীরেনবাবু ধরে নিয়েছিলেন মেয়ে কবে আসছে সেটা জানাতেই ফোন করেছে তাঁকে। কিন্তু সেই আশা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল তাঁর, যখন নদী কথায় কথায় বলল যে, সে এই উইন্টার ভ্যাকেশানে রঘুবীরপুরে আসতে পারবে না। কী যেন তার কাজ আছে।

বীরেনবাবু মেয়ে আসতে পারবে না শুনে তাঁর হতাশা লুকোতে পারলেন না। বলেই ফেললেন, আগের ছুটিতেও এলি না। আর বড়দিনের ছুটিতেও আসতে পারবি না বলছিস। তখনো তো বলেছিলিস কী দরকারি কাজ যেন আছে তোর। এবারো বলছিস তাই। কী ব্যাপার তোর নদী? তোদের স্কুলও তো ছুটি থাকে এই সময়। তবে!

নদী আমতা-আমতা করে। পরিষ্কার করে কিছু বলে না। শুধু বলে, আমি যেতে পারছি না ঠিকই কিন্তু তুমি এসো না। ক'দিন এখানে ঘুরে যাও। ভালো লাগবে দেখো।

বীরেনবাবু বুঝতে পারেন মেয়ে কিছু একটা বলতে চাইছে না তাঁকে। মেয়ে বড় হয়েছে। তার ব্যক্তিগত একটা জীবন থাকতেই পারে। মনে আঘাত পেলেও এ বিষয়ে আর কথা বাড়ালেন না বীরেনবাবু। দু-এক কথা বলার পর ফোন রাখলেন তিনি।

ফোন রাখলেও মেয়ের কথাগুলো ভুলতে পারেন না বীরেনবাবু। কী দরকারি কাজ ওর এই ছুটিতে? কী-ই বা লুকোতে চাইছে ও? কোনো বিপদে পড়েনি তো তাঁর মেয়ে? অনেক ভাবনাচিন্তা করে তাই একজন ট্রাভেল এজেন্টের মারফৎ বীরেনবাবু তৎকালে একটা টিকিট কেটেই ফেললেন পুরী এক্সপ্রেসের। ২৪ ডিসেম্বরের।

পঁচিশ তারিখ পুরী এক্সপ্রেস পুরী স্টেশনে পৌঁছল দু'ঘণ্টা লেটে। এর আগে মোট চারবার পুরী এসেছেন বীরেনবাবু। প্রথম দু'বার যখন নদী একেবারে ছোট্ট তখন সবাইকে নিয়ে। এরপর দু'বার। একবার মেয়ের স্কুলে চাকরির ইন্টারভিউ-এর সময়। আর দ্বিতীয়বার, নদী চাকরিটা পাওয়ার পর বাড়ি-ঘর ঠিকঠাক করে মেয়েকে এখানে থিতু করাতে।

স্টেশনের বাইরে আসতেই অটোওয়ালারা ছেঁকে ধরল বীরেনবাবুকে। ভাড়া ঠিকঠাক করে একটি অটোতে চড়ে বসলেন তিনি। এখন তাঁর গন্তব্য গৌরবাটশাহী।

পুরীর সমুদ্রকে বাঁ-পাশে রেখে অটো চলেছে হু-হু করে। সেই দিনের ফোনের পর, মধ্যের এই দিন সাতেকে প্রায় পাঁচ-ছ'বার ফোনে কথা হয়েছে বীরেনবাবুর নদীর সঙ্গে। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও তাঁর পুরী যাওয়ার কথা বলেননি মেয়েকে। নদী যদিও তার বাবাকে আসতে বলেছিল বেশ ক'বার, বীরেনবাবুই উল্টে যেতে পারবেন না বলেছেন।

আরও কিছুটা গিয়ে ডানদিকে একটু এগিয়েই অটো থামল একটা নীল রঙের দোতলা বাড়ির সামনে। এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি এটি। এই বাড়িরই একতলায় নদীর ভাড়া থাকার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বীরেনবাবু শেষবার এসে।

অটো থেকে নেমে একতলার কলিংবেল বাজাতে যাবেন বীরেনবাবু, ঠিক তখনি তাঁর খেয়াল হল বাইরে থেকে তালা লাগানো রয়েছে দরজায়। বীরেনবাবুর কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। এত সকালে মেয়েটা গেল কোথায়? আজ তো ২৫ ডিসেম্বর। আজ থেকে তো বড়দিনের ছুটি পড়ার কথা। তার মানে স্কুলও নেই। তবে!

মেয়েকে ফোন করবেন না কি ভাবছেন বীরেনবাবু, তখনি তাঁর মোবাইলটা বেজে উঠল। নদীর ফোন।

ফোনটা অন করে কানে ধরলেন বীরেনবাবু।—হ্যালো।

গুড মর্নিং বাবা। মেরি ক্রিসমাস টু ইউ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেরি ক্রিসমাস। কিন্তু তুই কোথায়? তোর বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে। দরজায় তালা।

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া আসে না সামান্যক্ষণ।

হ্যালো। হ্যালো। নদী তুই ফোনে আছিস তো?

হ্যাঁ বাবা। তুমি পুরী এসেছ? তুমি আসছ আমাকে তো বলনি। নদীর অভিমানী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

তুই ওসব ছাড়। তুই কোথায় এখন সেটা বল।

আমি তো এখন আশ্রমে।

কোন আশ্রমে? অবাক হন বীরেনবাবু।

বাবা, তুমি একটু ওখানেই দাঁড়াও, আমি আসছি।

না, না, তোকে আসতে হবে না। তুই যেখানে আছিস সেখানে কী করে যাব সেটা বল।

তাহলে তুমি একটা অটো নাও বাবা সামনের স্ট্যান্ডটা থেকে। বলবে রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম যাব। মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। আমি তোমার জন্য আশ্রমের বাইরেই অপেক্ষা করছি।

বীরেনবাবুর অটো এসে থামল বড় বড় করে 'রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম' লেখা একটা সুবিশাল গেটের সামনে। অটো থামতেই এগিয়ে এল নদী। বীরেনবাবুর ব্যাগটা অটো থেকে নামাল সে-ই। বীরেনবাবুকে প্রণাম করল সে।

কী ব্যাপার তোর? জিগ্যেস না করে পারেন না বীরেনবাবু।

ভেতরে চলো, সব বলছি। আগে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে প্রণাম কর তো।

বড় গেটটা দিয়ে ঢুকে চওড়া পিচের রাস্তা ধরে একটু এগোতেই ডানদিকে একটি মন্দির। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বীরেনবাবু ও নদী সেখানে প্রণাম করে একটা বড় বকুল গাছের তলায় এসে বসলেন।

এবার বল কী ব্যাপার? বীরেনবাবু জিগ্যেস করেন আবার।

হ্যাঁ বলছি। আমি আমাদের স্কুলে জয়েন করার ক'দিনের মধ্যে এই আশ্রম থেকে কয়েকজন পূজনীয়া মাতাজী আমাদের স্কুল অথরিটির মাধ্যমে সব টিচারদের রিকোয়েস্ট করেন, তাঁরা একটা সমাজসেবামূলক প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন তাতে যেন আমরা পার্টিসিপেট করি। প্রোজেক্টটা এরকম—পুরী সংশোধনাগারে বেশ কয়েকজন মহিলা অভিযুক্ত আছে যারা একেবারেই লেখাপড়া জানে না, তাদের লিটারেট করা। জানো বাবা, আমাদের স্কুল থেকে, আনফরচুনেটলি আমি ছাড়া কেউ জয়েন করেনি এই প্রজেক্টে। শনি, রবি আর অন্য সব ছুটির দিনগুলোতে সকালের এই সময়টায় ওদেরকে সংশোধনাগার থেকে এখানে নিয়ে আসে পুলিশকর্মীরা। কয়েক ঘণ্টা ওদের ক্লাস নিই আমি। বাবা, তুমি তো জানো, ঠাকুর-মা আমাকে ছোট থেকেই কত টানতেন। তুমিই তো আমাকে কত ঠাকুরের কথা—মায়ের কথা শুনিয়েছ। বেলুড় মঠে নিয়ে গেছ। কামারপুকুর-জয়রামবাটি, বাগবাজারে মায়ের বাড়ি—কোথায় নিয়ে যাওনি! এমনকী রামকৃষ্ণ মঠ থেকে আমার দীক্ষার ব্যবস্থাও করেছ।

ঠাকুর তো শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেই গেছেন, তাই না বাবা! ঠাকুর-মায়ের এই আশ্রমে তাঁদের দেখানো পথে একটু চলতে পেরে কী যে প্রশান্তি পাই মনে, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। টানা এতগুলো কথা বলে এবার থামে নদী।

এতক্ষণে বীরেনবাবুর কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়। তিনি বলেন, সব বুঝলাম রে মা। এই কারণেই তুই ছুটিতেও যাসনি বাড়িতে। কিন্তু এত সুন্দর একটা কাজ তুই করছিস, সেটা আমাকে বলিসনি কেন? বিদেশ- বিভুঁই-এ একা থাকিস, আমার চিন্তা হয় না তোর জন্য, বল?

সরি বাবা। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পেয়ে আমাকে বারণ করবে এই প্রোজেক্টের সঙ্গে কানেক্টেড হতে।

দূর বোকা মেয়ে। মেয়ের মাথায় সস্নেহে হাত রাখেন বীরেনবাবু। যার মাথায় ঠাকুর আর মায়ের আশীর্বাদের হাত আছে, যে ঠাকুর ও মায়েরই দেখানো পথে চলছে, তার জন্য আবার ভয় করব কি আমি! শ্রীশ্রীমা তো বলেই গেছেন, তিনি থাকতে তাঁর সন্তানদের কোনোই ভয় নেই...

কথা শেষ করতে পারলেন না বীরেনবাবু, কারণ ঠিক তখনি হুটার বাজিয়ে একটা পুলিশের পাইলট জিপ আর একটি প্রিজন ভ্যান এসে ঢুকল আশ্রমের মূল ফটক দিয়ে।

বাবা, ওরা এসে গেছে। আমি তাহলে যাই। তুমি মন্দিরেতেই থেকো। এদিক-ওদিক একটু ঘুরে-ফিরে দেখতেও পার। মন্দিরের পিছনে একটা বুক-স্টোরও রয়েছে। দুপুরে ঠাকুর আর মায়ের প্রসাদ পেয়ে তারপর একেবারে বাড়ি ফিরব, কেমন?

বীরেনবাবু শুধু বলেন, ঠিক আছে।

মেয়ের জন্য গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে।

জয়ন্তী সেনগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার **দ্বিতীয়** পুরস্কৃত গল্প

বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

ছবি : রুদ্রনীল ঘোষ

মঞ্জুলা চক্রবর্তী

শ্রীশ্রী সারদা মায়ের 'খুকি' সিস্টার নিবেদিতা (মার্গারেট নোবেল)-র কথা কে না জানে? শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামন্ত্রে দীক্ষিতা কন্যাদের সমাজসেবা বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমে তাঁর কথাই মনে পড়ে। কিন্তু, আজ আমি এমন এক সন্ন্যাসিনীর কথা বলব যাঁর হৃদয়ে শ্রীসারদা মা, মননে ও চিন্তনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কর্মে স্বামী

বিবেকানন্দ আমৃত্যু জাগরূক ছিলেন।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীমতী পঙ্কজ-কুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেণুকা জন্ম নিয়েছিলেন ১৯১৫ সালের ৯ ডিসেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেও তিনি গৃহী হতে চাইলেন না। সংসারত্যাগী এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ১৯৪৬ সালে স্বামী নির্বেদানন্দের আহ্বানে সিস্টার নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীসারদা মায়ের আশীর্বাদধন্য 'নিবেদিতা স্কুল'-এর প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করলেন। শর্তানুসারে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না এবং 'সারদামন্দির' নামের আবাসিক ছাত্রীনিবাস আশ্রমে বাস করতেন।

এই সেবাপরায়ণা মানুষটি পরবর্তীকালে সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে মঠে বাস করতে এলেন। সারদা মঠে তিনি আসেন ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি যে আটজনের সন্ন্যাস হয় রেণুকাদেবী তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর নাম হল প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা। নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ মানুষই তো মঠজীবনে নেতৃত্বের পক্ষে আদর্শ। এই সন্ন্যাসিনী তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান সম্বল করে গরিব মানুষদের উপকার করার আগ্রহে মঠের উল্টোদিকে টালির ছাদ দেওয়া একটি ছোট ঘরে সপ্তাহে দু'দিন দাতব্য চিকিৎসা শুরু করেন। অনেক সময় রোগীর বাড়ি গিয়ে তাদের দেখাশোনা ও শুশ্রূষা করতেন। কখনও কখনও তাদের জন্য দুধ ও টিফিনের ব্যবস্থাও করতেন।

একবার নওদাপাড়ার বস্তিতে গিয়ে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশুকে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে থাকতে দেখে এই সন্ন্যাসিনী মঠে ফিরে নিজের বিছানা গুটিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন তার জন্য।

মোক্ষপ্রাণা মাতাজী পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর সারদা মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো, তাঁর মামা সত্যেশচন্দ্র মিত্র ছিলেন শ্রীসারদা মায়ের কৃপাধন্য। তাঁর সঙ্গে রেণুকাদেবী কৈশোরে বেলুড় মঠে গিয়ে সাক্ষাৎ পান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের। তাই ছোট থেকেই তাঁর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি টান ছিল অমোঘ। ১৯৩৫ সালে রামনবমীর পুণ্যদিবসে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিকট রেণুকাদেবীর দীক্ষালাভ ঘটে।

প্রেমেশানন্দ মহারাজ তাঁর সন্ন্যাসিনী জীবনের শুরুতেই লিখেছিলেন, 'তুমি আমাদের বহুবাঞ্ছিত নারীজাগরণ ব্রত উদ্‌যাপন করিবে ভাবিয়া আনন্দিত হই।' ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে সারদা মঠ থেকে মাতাজী এলেন দক্ষিণেশ্বরে বারুইপাড়া লেনের শাখাকেন্দ্রে এবং সেখানে দশ বছর ছিলেন।

মোক্ষপ্রাণা মাতাজীর উপর আলম-বাজারের রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্বিতীয় শাখা 'রামকৃষ্ণ শিক্ষামন্দিরের' দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানকে শিশুদের উপযোগী করে তুলতে মাতাজীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অবশ্য স্মরণীয়। তিনি পাড়ায়-পাড়ায়, বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তির জন্য অনুরোধ করায় প্রথমে পঞ্চাশজন ভর্তি হয়। পরে দশজন বিদায় নিলেও, তাঁর শিশুদের বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিনি বলতেন, 'আমি প্রতিটি শিশুকে শ্রদ্ধা করি।' স্কুল ছিল তাঁর কাছে বাল-গোপালের মন্দির। তাঁর পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরিচালনায় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ের রূপ পেল। লেখাপড়ার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ-গান, ছবি আঁকা, সেলাই, হাতের কাজ, আবৃত্তি, ব্রতচারী ইত্যাদি শেখানো হত। মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

শিশুদের অভিভাবক ও স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে মোক্ষপ্রাণা মাতাজীর গড়ে উঠেছিল নিবিড় ও আত্মিক সম্পর্ক। তাঁদের নিয়ে তিনি 'জননী সঙ্ঘ' গড়ে তুললেন। সপ্তাহে দু'দিন তিনি নিজে তাঁদের ক্লাস নিতেন। মাতাজীর উৎসাহে 'জননী সঙ্ঘ' স্থানীয় গরিব ছেলে- মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য 'সারদামণি পাঠশালা' শুরু করে। মাতাজী শিক্ষামন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের ক্রমে মঠ-মিশনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন।

১৯৭৩ সালে তাঁর নতুন জীবন শুরু হল সারদা মঠের সঙ্ঘাধ্যক্ষারূপে। সঙ্ঘনেত্রী হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নতুনদের উদ্দেশে মাতাজী লিখে গেছেন, 'সঙ্ঘের আদর্শ মানেই শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ।' তাঁর মুখখানিকে সবসময় ঘিরে থাকত শ্রীশ্রীমায়ের আলো, যেন মা সারদাই তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিতা।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। বারুইপাড়ায় স্কুলের পাশে এক গরিব মুসলমান মেয়ে তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাত। মাতাজী নিজে উদ্যোগী হয়ে মেয়েটিকে স্কুলে বাসন মাজার কাজ দিলেন, যাতে সে তার ছেলেকে মানুষ করতে পারে। মাতাজী নিজে কখনও কখনও বেরিয়ে. পড়তেন গরিবদের অর্থসাহায্য করার জন্য।

হয়তো কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে অর্থসাহায্য (সাময়িক ঋণের ব্যবস্থা) করলেন। সদাসর্বদা তিনি আর্তজনের সেবা করেছেন —কখনও অর্থসাহায্য করে, কখনও কর্মের ব্যবস্থা করে, আবার কখনও সুমিষ্ট বচন ও আশীর্বাণী দিয়ে।

মাতাজীর মাতৃত্ববোধ এত প্রবল ছিল যে তিনি সেটি শুধু ভক্ত-সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কোনও মেধাবী ছেলে অর্থাভাবে পড়াশোনায় বাধা পাচ্ছে, তাকে সাহায্য করার জন্য তিনি অন্য ভক্তকে জানাতেন। কারও হয়তো অনেক কষ্টে সংসার চলে, নানাভাবে তিনি চেষ্টা করতে থাকেন কীভাবে ছেলেটির কর্মসংস্থান হয়। অর্থসাহায্য দিয়ে তিনি তার অস্থায়ী চায়ের দোকানটি চালু করার এবং তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

মাতাজীর মধুর ব্যবহার ও ভালোবাসার টান কেউই উপেক্ষা করতে পারত না। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে তিনি সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা হিসাবে সমাসীন ছিলেন। সেবাব্রতই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। সাধারণ মানুষের দুঃখে- বিপদে মাতাজী অত্যন্ত বিচলিত হতেন।

স্বামীজীর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই মানুষের হিতার্থে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন এই পুণ্যবতী সন্ন্যাসিনী। তাঁর মতে আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, সহমর্মিতার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ। ৩০ আগস্ট, ১৯৯৯ রাত্রি ২-২৫ মিনিটে এই মহাপ্রাণা সন্ন্যাসিনী রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করলেন। তাঁর পার্থিব তনু লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেও আজও ভক্তজনের হৃদয়ে তিনি চিরভাস্বর।

পুরস্কৃত গল্প

তপন কুমার বৈরাগ্য

জয়ন্তী সেনগুপ্ত স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার তৃতীয় পুরস্কৃত গল্প

করুণাময়ী

ছবি : কৃষ্ণেন্দু ঘোষ

মানবসেবার ব্রতে যিনি ক্লান্তিহীনা; ভালোবাসার অমৃতময় মন্ত্রে যিনি দীক্ষিতা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বোধনে যিনি লোকমাতা তিনি হলেন বিবেকানন্দের মানসপুত্রী আইরিশ কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড, মা মেরি ইসাবেল। ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের ডাঙ্গানন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীনা হন। ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যেই তিনি বড় হতে থাকেন। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় হয়। ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ডাকে ভারতে আসেন। ঐ বছর ২৫ মার্চ বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে নির্দেশ দিলেন সারাজীবন কঠোর সংযম করতে এবং গৌতম বুদ্ধের মতো মানবসেবায় আত্মোৎসর্গ করতে।

এর আগে ১৮৯৮ সালের ১৭ মার্চের ঘটনা। ঐদিন তিনি এলেন সকলের মা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পদপ্রান্তে। মা পেলেন তাঁর অঞ্চলের নিধি স্নেহের খুকিকে। ঐ নামেই সারদা মা তাঁকে সারাজীবন ডাকতেন। মায়ের অপার্থিব ভালোবাসা আর স্নেহের স্পর্শে তিনি হলেন ভারতবাসীর স্নেহময়ী ভগিনী ও মাতা। ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর ১৬ নং বোসপাড়া লেনে তিনি শুরু করলেন মেয়েদের স্কুল। এই স্কুল উদ্বোধন করলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। সারদাদেবী তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে গড়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে নিবেদিতা ছিলেন মাতৃস্বরূপা। একদিন প্রফুল্লময়ী নামে এক ছাত্রীকে না খাইয়ে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে চলে যান। হঠাৎ মনে পড়ে প্রফুল্লকে তাঁর খাওয়ানো হয়নি। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি চলে আসেন এবং নিজের হাতে তাকে খাওয়ান। এমনই ছিল নিবেদিতার সেবা, মানবতা এবং আন্তরিকতা।

'গোপালের মা' নামে এক বিধবা মহিলা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর পরম প্রিয়,

যাঁকে তাঁরা মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ গোপালের মাকে নিজের বাড়িতে রেখে নিবেদিতা শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সেবা-যত্ন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের দেশকে নিবেদিতা নিজের স্বদেশ বলেই ভেবেছিলেন। ভারতবাসীর দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগরোগ মহামারির আকার ধারণ করলে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে প্লেগের মোকাবিলা করতে পথে নেমে পড়লেন। নিজের হাতে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে লাগলেন। ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। প্লেগ প্রতিরোধের নিয়মকানুন সম্বন্ধে 'সু-স্বাস্থ্যের কথা' নামে লিফলেট বিলি করতে থাকলেন। একজন বিদেশি নারীকে এইরকম সেবা করতে দেখে এগিয়ে এলেন যুব সম্প্রদায়। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা সেবাকাজ করতে লাগলেন। দূর হল প্লেগ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমৃতময় বাণী—'যত মত তত পথ' তাঁর মনে সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা এনে দিয়েছিল।

নিবেদিতা ছিলেন ভারতবর্ষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ভারতবাসীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা, মমত্ববোধ দেখে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—'ভবিষ্যৎ ভারতসন্তানদের কাছে তুমি একাধারে জননী, সেবিকা ও বন্ধু হয়ে ওঠো।'

১৯০২ সালের ৪ জুলাই বিবেকানন্দ অমৃতলোকে যাত্রা করলে নিবেদিতা গুরুর অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

নিবেদিতার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীঅরবিন্দ, সরোজিনী নাইডু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আরও অনেক মনীষীর।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে নিবেদিতা নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় ভগিনী নিবেদিতার অবদান কোনো অংশে কম নয়। স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ছিলেন তাঁর প্রেরণার উৎস।

১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর আমরা হারাই এই মহীয়সী নারীকে। কিন্তু তাঁর প্রেম, কর্ম, জীবনাদর্শ, ভারতপ্রেম আমাদের চিরদিনের চলার পাথেয়। অরবিন্দের বিদ্যুৎশিখা, রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, বিবেকানন্দের মানসকন্যা এবং সারদা মায়ের স্নেহ-স্নিগ্ধা কন্যা চিরকাল থাকবেন অমর হয়ে।

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস (কালনা, পূঃ বর্ধমান)।। সমর ঘোষ (সুরেন সরকার রোড, কল-১০)।। প্রার্থনা পাঠক (রাজপুর, কল-১৪৯)।। ঊষসী ঘোষ (ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর)।। বৈদ্যনাথ পাল (বৈদ্যবাটী, হুগলি)।। বাসুদেব সেন (জাঙ্গীপাড়া, হুগলি)।। রুনা বসু (বেলঘরিয়া, কল-৫৬)।। বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস (দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান)।। বিবেকানন্দ নস্কর (সন্তোষপুর, দঃ ২৪ পরগনা)।। সৌম্য সেনগুপ্ত (জামসেদপুর, ঝাড়খণ্ড)।।

বিশেষ পুরস্কার

এএখন আপনারা আরও পুরস্কার পাচ্ছেন। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি. চন্দ্র, তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কারপ্রাপকরা ঃ সৌরীশ মিশ্র, মঞ্জুলা চক্রবর্তী, তপন কুমার বৈরাগ্য, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস ও সমর ঘোষ।

*সোহিনী সরকার
জন্ম ঃ ১৭ জুলাই ১৯৯৫
মৃত্যু ঃ ১৪ এপ্রিল ২০১৪

ঘোষণা

*৭৬, মানিকডাঙা রোড (শান্তিনগর), পোঃ ঘোলাবাজার, কলকাতা-৭০০১১১ থেকে কাজল সরকার ও সাধনচন্দ্র সরকার তাঁদের অকাল প্রয়াতা কন্যা কুমারী সোহিনী সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে *সোহিনী সরকার স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি। যোগাযোগ করার জন্য অবশ্যই ফোন নম্বর দেবেন।*

বিষয়বস্তু

কন্যাসন্তান অবহেলার নয়

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ জ্যৈষ্ঠ। পুরস্কৃত লেখা তিনটি শুকতারার ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হবে।

পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ঃ ৫০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৪০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার ঃ ৩০০ টাকা

চিঠিপত্র

মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়

শারদীয়া শুকতারা ১৪২৪

সৈকত মুখোপাধ্যায় এবং হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত দুজনেই আমার প্রিয় লেখক। শারদীয়া সংখ্যায় ওঁদের লেখা যথাক্রমে 'পিশাচ কারখানা' এবং 'কূর্ম দেবতার কামড়' উপন্যাস দুটি খুব ভালো লেগেছে। ফিচার, ভ্রমণ বিভাগগুলির লেখাও বেশ ভালো। তবে শারদীয়া সংখ্যার কমিক্স আরও জমজমাট হওয়া উচিত ছিল। ধন্যবাদ।

অরূপরতন আইচ

(১৮৫/১৬৫ রাজীব গান্ধী রোড, কোন্নগর, হুগলি-৭১২২৩৫)

আমাদের ঠিকানা
সম্পাদক শুকতারা
(বিভাগের নাম)
১৭, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অনেক কিছু পেয়েছি

দেরি হলেও সবাইকে জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই শুকতারা আমার অনন্য বন্ধু। অনেক কিছু পেয়েছি শুকতারা থেকে। তাই আজও শুকতারা আমার প্রিয় বন্ধু। কিন্তু বর্তমানে দাদুমণির চিঠি, মনের জানলা—এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির জন্য খুব খারাপ লাগছে।

অনন্যা মিত্র

(চিনপাই, বীরভূম)

হারিয়ে যাচ্ছে অতীত ঐতিহ্য

নতুন করে আর কী বলব, জ্ঞান হবার পর থেকেই তো শুকতারার সঙ্গে পরিচয়। আগে শারদীয়া সংখ্যায় থাকত উপন্যাস, মহাজীবনের গল্প, অলৌকিক, গোয়েন্দা, ভৌতিক, হাসি, সামাজিক, শিকার ইত্যাদি নানান বিচিত্র কাহিনি। এখন এর মধ্যে সবগুলি পেলাম না। আগের মতো করে কি শারদীয়া ফিরে আসবে না? শুকতারা যে বড় আদরের। শুকতারা ততদিনই থাকবে যতদিন এই পৃথিবী থাকবে। প্রণাম।

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য

(গ্রাম ও পোস্ট-দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২)

প্রসঙ্গ পোস্ট অফিস

আমি বহুদিন থেকেই শুকতারার নিয়মিত পাঠক। আমার নাম মহঃ উজান আহ্‌মদ। অগ্রহায়ণ ১৪২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় একটি ফিচার 'ডাকটিকিটে যোগাসন'। খুবই প্রাসঙ্গিক এই লেখা। আমার চিঠি লিখতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু আমাদের পোস্ট অফিসে এক কথায় কিছুই পাওয়া যায় না চিঠি লেখার জন্য। একা আমি নই, আমার বন্ধুও একই সমস্যায় জর্জরিত। G.P.O. থেকে আমাদের চিঠি লেখার সামগ্রী কিনে আনতে হয়। তাই আমার অনুরোধ সব পোস্ট অফিসে প্রয়োজনীয় চিঠি লেখার সামগ্রী পাওয়া যায় না বা এরকম কোনো ফিচার প্রকাশিত হয় তবে আমরা খুবই উপকৃত হব। ইতি শ্রদ্ধান্তে

মহঃ উজান আহ্‌মদ

(পোঃ ও গ্রাঃ-গোচরণ, থানা ঃ-জয়নগর, জেলা ঃ-২৪ পরগনা (দঃ)-৭৪৩৩৯১)

উত্তর ঃ স্নেহের উজান, তোমার আবেদন সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলাম। আর এই প্রসঙ্গে ফিচার প্রকাশ করার চেষ্টা অবশ্যই করব। তোমার হাতের লেখাটি খুব সুন্দর। তুমি আরও চিঠি লিখো, কেমন?

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

শিশুসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা

আমার বয়স ৮৪ বছর। স্কুলের বয়স (১৯৪৮) থেকেই আমি শুকতারা পড়ে আসছি। এখনও পড়ি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোটদের জন্যেও লিখি।

এখন কলকাতা ও বিভিন্ন শহরে বড়দের সাহিত্য পাঠের আসর বসে। বড়রাই সেখানে তাঁদের লেখা পাঠ করেন। ছোটবেলায় আমি সাতক্ষীরা শহরে (বর্তমানে বাংলাদেশে) কিছুদিন ছিলাম। একজন শিক্ষক তাঁর বাড়িতে ছোটদের জন্য 'শিশু মধুভাণ্ড' নাম দিয়ে সাহিত্যসভা করতেন। ছুটির দিনে বসত সেই আসর। উপস্থিত সবাই তাঁদের লেখা গল্প-কবিতা-ছড়া-ছোট প্রবন্ধ শোনাতেন। মাঝে-মধ্যে ছড়া লেখার প্রতিযোগিতাও হত। খুবই জনপ্রিয় ছিল এই সাহিত্যসভা। আগেকার দিনে এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য অনেকে তাঁদের একখানা ঘর ছেড়ে দিতেন। স্কুলের ক্লাসরুমও পাওয়া যেত অনেক জায়গায়।

কয়েক বছর আগে কলকাতার একটা স্কুলের প্রাক্তনীরা ঐ স্কুলের ছাত্রদের জন্য রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। আমি অন্যতম বিচারক হয়ে সেখানে যাই। যে সব ছাত্র প্রতিযোগিতায় সফল হল তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবার জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করা হল। তিনি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য পরে আসবেন বলে চলে গেলেন। আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি না আসায় আমরাই পুরস্কার বিতরণ করলাম। ধন্যবাদ।

শিশির কুমার নিয়োগী

('প্রথম সোম' সাহিত্যসভা, সল্ট লেক, সি কে ৫৮, কলকাতা-৭০০০৯১)

সেরা চিঠি

সেরা চিঠি প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারেন। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নীচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খাম বা ইনল্যান্ডের ওপর 'সেরা চিঠি' কথাটি লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) .....

সম্পূর্ণ ঠিকানা .....

দেব সাহিত্য কুটীরের চিরকালীন বইয়ের সম্ভার

পূজাবার্ষিকী

শুকসারী ১৫০.
দেবায়ন ১০০.
গল্প বলি শোনো ১০০.
নীহারিকা ১৫০.
ছায়াপথ ১০০.
কনকচাঁপা ১০০.
অরুণাচল ১৫০.
সোনার ঝাঁপি ১০০.
ছোটদের চয়নিকা ৫০.
শ্যামলী ১৩০.

কমিক্স

নারায়ণ দেবনাথ
হাঁদা-ভোঁদা সমগ্র ৫৮০.
বাঁটুল সমগ্র ৫৮০.
বাহাদুর বেড়াল সমগ্র ২০০.
গোয়েন্দা কৌশিক ২০০.

ময়ূখ চৌধুরী
ছবিতে অ্যাডভেঞ্চার ২০০.

জুরান নাথ
বিচ্ছুর জাদুশক্তি ৪৫.

শুকতারা সিরিজ

শুকতারা-র ১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প (প্রথম খণ্ড) ২৮০.
শুকতারা-র ১০১ গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প (দ্বিতীয় খণ্ড) ২৮০.
শুকতারা-র ১০১ ভূতের গল্প (প্রথম খণ্ড) ২৫০.
শুকতারা-র ১০১ ভূতের গল্প (দ্বিতীয় খণ্ড) ২২৫.
শুকতারা-র ১০১ ভূতের গল্প (তৃতীয় খণ্ড) ২৫০.
শুকতারা-র ১০১ হাসির গল্প ২৫০.
শুকতারা-র ১০১ রূপকথার গল্প ৩৫০.
লীলা মজুমদারের শুকতারা-র সেরা গল্প ১০০.
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শুকতারা-র সেরা গল্প ৮০.
প্রফুল রায়ের শুকতারা-র সেরা গল্প ১২০.
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শুকতারা-র সেরা গল্প ৯০.
আশাপূর্ণা দেবীর শুকতারা-র সেরা গল্প ১৫০.
নবনীতা দেবসেনের শুকতারা-র সেরা গল্প ৯০.
সেরা শুকতারা- ১ম খণ্ড (১৩৫৪-১৩৭৯) ১৪০.
সেরা শুকতারা- ২য় খণ্ড (১৩৮০-১৪০৪) ১৪০.

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দূরভাষ- ২৩৫০-৪২৯৪, ৪২৯৫,৭৮৮৭
ওয়েবসাইট- www.devsahityakutir.com
ই-মেল- dev_sahitya@rediffmail.com

সূর্যদেবের স্বয়ংবর

দীপান্বিতা রায়

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

এক যে ছিল দেশ। সে দেশের নাম কাঞ্চনপুর। মস্ত দেশ। অনেক মানুষ বাস করে সেখানে। কাঞ্চনপুরের একপাশে রয়েছে বিশাল এক জঙ্গল। সবুজ ডালপালা ছড়ানো বড় বড় গাছে ভর্তি সেই জঙ্গল গিয়ে মিশেছে আরও অনেক দূরের নীল পাহাড়ে। আর তিন দিক দিয়ে বয়ে গেছে ভারী চমৎকার ঝিকিমিকি জলে ভরা এক নদী। নদীর নাম ঘূর্ণি। বেশ চওড়া আর গভীর নদী। সারা বছরই কুলুকুলু জলে ভরা। কাঞ্চনপুরের জেলেরা ঘূর্ণি নদীতে মাছ

ধরে। আবার শরৎকালে বণিকরা তাদের ছোট-বড় ময়ূরপঙ্খি নৌকা সাজিয়ে বাণিজ্য করতে যায়। ভিনদেশের মানুষ এই নদী বেয়েই এসে পৌঁছোয় কাঞ্চনপুরে। দেশের রাজার রণপোতগুলিও সাজানো থাকে ঘূর্ণির ধারেই। অবশ্য সাজানোই সার। কাঞ্চনপুরের রাজা বজ্রদেব ভারী ভালোমানুষ। যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। তিনি তাঁর প্রজাদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকতে ভালোবাসেন। প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক। সেই সব দেশ থেকে কেউ কাঞ্চনপুরে বেড়াতে এলে রণপোতগুলি থেকে তোপধ্বনি করা হয়, তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

কাঞ্চনপুরের রানি মহিশিলাও মাটির মানুষ। প্রজারা তাঁকে মায়ের মতো ভালোবাসে। রানি মহিশিলা কিন্তু ভারী বিদুষী। তিনি নানাভাবে রাজকার্যে সাহায্য করেন। রাজপ্রাসাদের সব দায়িত্বও তাঁরই হাতে। প্রাসাদের সব দেখাশোনা, অতিথি- অভ্যাগতদের আপ্যায়ন, পাকশালার দেখভাল সবই করেন রানি নিজে। কাঞ্চনপুরের রাজপুত্র সূর্যদেব যখন ছোট ছিল, তখন তারও দেখাশোনা রানি মহিশিলাই করতেন। তবে এখন তো রাজপুত্র বড় হয়ে গেছে। গুরুগৃহে থেকে পড়াশোনা শেষ করে অনেক বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। সেনাপতির কাছে তির-ধনুক চালানো, তলোয়ার খেলা শিখেছে। দেশ-বিদেশ ঘুরে শিখে এসেছে রাজ্য চালানোর নানা সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুন। দেখে-শুনে বুড়ো মন্ত্রী দাড়ি নেড়ে বলেছেন, মহারাজ, রাজপুত্র এখন তৈরি। আপনি এবার অভিষেকের ব্যবস্থা করুন। সূর্যদেবকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা ছুটি নেব। তখন আমি আর আপনি সারাদিন বসে দাবা খেলব। দেখবেন আমি কেমন রোজ আপনাকে কিস্তিমাত করে দিই।

রাজার অবশ্য এতে আপত্তি নেই মোটেই। উপযুক্ত ছেলের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে তিনিও নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু গোল বাধিয়েছেন রানিমা। তাঁর বক্তব্য হল, ছেলের আগে বিয়ে দিতে হবে, তারপর তাকে সিংহাসনে বসানো হবে। রানি বসবে পাশের আসনে। তারপর দুজনে মিলে রাজ্য চালাবে। কারণ রানি মহিশিলা মনে করেন, পুরুষমানুষ শুধু নিজের বুদ্ধিতে কোনও কাজ করতে গেলেই নানারকম গণ্ডগোল করে বসে। তাকে সামলে-সুমলে ঠিক জায়গায় রাখার কাজটি করে মেয়েরা। তাঁদের যদি একটি মেয়ে থাকত, মানে কাঞ্চনপুরে যদি একজন রাজকন্যা থাকত, তাহলে কোনও সমস্যা ছিল না। ভাই-বোনে মিলে দিব্যি রাজ্য চালাতে পারত। কিন্তু তা যখন নেই, তখন বিয়ে করে তবে সিংহাসনে বসবে সূর্যদেব।

তাতেও অবশ্য কোনও সমস্যা প্রথমটায় ছিল না। রানির কথা শুনে রাজা বজ্রদেব তো মহাখুশি। রাজপুত্রের বিয়ে মানে তো একটা হৈহৈ-চৈচৈ ব্যাপার। দেশ-বিদেশ থেকে সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা আসবে। সাতদিন ধরে ভোজ চলবে। প্রজারা নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে। ছেলেপুলেরা নাচ- গান আনন্দ করবে। এসবই রাজার খুব পছন্দ। বজ্রদেব তাই তক্ষুনি ভাটদের খবর পাঠিয়েছিলেন। তারাও মহাখুশি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছুদিন পরে নানা দেশ ঘুরে খবর নিয়ে এসেছিল রাজকন্যাদের। সেইসব রাজকন্যাদের একেকরকম রূপ, একেকরকম গুণ। কারুর গায়ের রঙ গোলাপ ফুলের মতো, গান গায় কোকিলকণ্ঠে। কাউকে দেখলে মনে হয় যেন বসন্তের কচি আম্রপল্লব। বাতাসের মতো ঢেউ খেলে যায় তার নাচের মুদ্রা। সাত সমুদ্র পেরিয়ে দারুচিনি দ্বীপের রাজকন্যাকে দেখলে তো মনে হয় যেন সবে ভোরের আকাশে সূর্যের আলোর রঙ ধরেছে। সারাক্ষণ পুঁথিপত্রে মন থাকে বলে তার চোখদুটিও নীল সমুদ্রের মতো গভীর।

রানি মহিশিলাও ভারী সুন্দরী। তাঁর নিজের গায়ের রঙটি ঠিক অপরাজিতা ফুলের মতো। এতসব সুন্দরী রাজকন্যার ছবি দেখে তিনি তো খুশিতে ডগমগ। রাজা বজ্রদেবও খুশি। কিন্তু ভাটদের আনা সব রাজকন্যার ছবি দেখে আর গুণপনা শুনেও পছন্দ হল না রাজপুত্র সূর্যদেবের। তার মনে হল সবাই যেন বড্ড মামুলি। কাঞ্চনপুরের রানি যে হবে তাকে হতে হবে রূপে-গুণে অতুলনীয়া। রাজপুত্রের এমন সব কথাবার্তা শুনে রানি তো মহাবিরক্ত। আর একটু হলেই তিনি আগেকার দিনের মতো বলে বসছিলেন, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে, যে ঘুঁটেকুড়ুনিকে প্রথম দেখব, তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

রাজা বজ্রদেব অতিকষ্টে রানিকে আটকালেন। একমাত্র ছেলে, তার ওপর অত রাগারাগি না করাই ভালো। কিন্তু সমস্যার তো একটা সমাধান চাই। শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের সঙ্গে রাজা বজ্রদেব আর মন্ত্রীমশাই বসে অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, রাজকন্যাদের জন্য যেমন স্বয়ংবর সভা ডাকা হয়, সূর্যদেবের জন্যও সেরকম স্বয়ংবর সভা ডাকা হবে। নিমন্ত্রণ পাঠানো হবে দেশ-বিদেশে। শুধু রাজকন্যা নয়, রাজা ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেবেন, স্বয়ংবর সভায় আসার অধিকার থাকবে সবার। যে মেয়েরা রাজপুত্রকে বিয়ে করতে চাইবে, তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি আর অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা নেবে সূর্যদেব। যে জয়ী হবে, তার গলাতেই মালা দেবে রাজপুত্র।

সব কথা হয়ে যাওয়ার পর মন্ত্রীমশাই দাড়ি নেড়ে বললেন, কিন্তু মহারাজ, একটা তো মস্ত ফাঁক রয়ে গেল। আমাদের রাজপুত্রের যেরকম ক্ষুরধার বুদ্ধি, তাতে এমন হতেই পারে যে রাজকন্যারা কেউই ওনার পরীক্ষায় জিততে পারলেন না। তখন কী হবে? তাহলে কি রাজপুত্র সারাজীবন বিয়ে না করেই থেকে যাবেন?

রানি মহিশিলা খানিকক্ষণ আগেই ঘরে ঢুকে চুপচাপ একপাশে বসেছিলেন। আলোচনায় যোগ দেননি। এবার তিনি ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, সেটি হতে দেওয়া যাবে না। সূর্যকে কথা দিতে হবে, যদি কোনও রাজকন্যাই ওর কঠিন পরীক্ষায় উৎরোতে না পারে, তাহলে আমার যাকে পছন্দ হবে, তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব।

মায়ের কথা শুনে রাজপুত্র হেসে ফেলে ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। রাজকন্যারা যদি হেরে যায়, তখন আমি মায়ের পছন্দেই বিয়ে করব।

কথাবার্তা সব হয়ে যাওয়ার পরই, রাজ্যজুড়ে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে দেশ-বিদেশে ছুটল দূতের দল। স্থপতিদের ডেকে রাজা নির্দেশ দিলেন বড় বড় সুন্দর অতিথিশালা তৈরি করার। নানা দেশে থেকে যেসব রাজকন্যারা আসবে তারা তাদের সখী-অনুচরদের নিয়ে থাকবে সেখানে। রাস্তা-ঘাট সব পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন করে দু'ধারে ফুলের চারা লাগানো হল। আলোর মালায় সেজে উঠতে লাগল গোটা কাঞ্চনপুর রাজ্য। এদিকে রাজার অনুচররা বেরিয়ে পড়ল ঢোল-ডগর নিয়ে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঢোল-ডগর বাজিয়ে তারা ঘোষণা করতে লাগল রাজপুত্র

সূর্যদেবের জন্য কনে বাছাইয়ের আয়োজন হয়েছে। যে মেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধি আর অস্ত্রশিক্ষায় রাজপুত্রকে হারাতে পারবে সেই হবে রাজ্যের ভাবি রানি। ঢোল- ডগরের আওয়াজ শুনে গেরস্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মেয়ে-বউরা। পুকুরঘাটে, আমতলায়, চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা চলতে লাগল।

এমনি করেই একটু একটু করে এসে পড়ল সেই বিশেষ দিনটি। সেদিন বাসন্তী পূর্ণিমা। গাছে গাছে ফুটে আছে টুকটুকে লাল শিমুল আর আগুনরঙা পলাশ। মৌমাছিরা গুনগুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমের মুকুলের চারপাশে। সরু ঠোঁটটি ঢুকিয়ে মন্দার ফুলের মধু চুরি করছে মৌটুসি। ঝলমল করছে রোদ্দুর। মৃদু-মন্দ বইছে দখিনা বাতাস। ঘূর্ণি নদীর বুকে রঙ-বেরঙের ময়ূর আর মকরমুখো নৌকার ছড়াছড়ি। এক একটি নৌকা এসে থামছে আর তার থেকে নেমে আসছে অপরূপ রূপসী এক একজন রাজকন্যা। কারুর গলায় মুক্তার হার। কারুর হাতে পান্নার বালা। কেউ বা সিঁথিতে পরেছে প্রবালের সিঁথিমৌর।

রাজপ্রাসাদের পাশে বিশাল মাঠে বসার আয়োজন। একদিকে বসবে সব কন্যেরা। শুধু রাজকন্যা নয়, প্রতিযোগিতায় যে মেয়ে অংশ নিতে চায়, সেই বসতে পারে সেখানে। সাদা ধপধপে রেশমে মোড়া আসনে বসার ব্যবস্থা। ঠিক মাঝখানে গোল একটি মঞ্চ। সেখানে রাখা আছে দুটি আসন। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে ঘোষক এসে ঘোষণা করলেন, মঞ্চের ওপরে রাখা দুটি আসনের একটিতে বসবে রাজপুত্র সূর্যদেব। অন্যটিতে বসবে প্রতিযোগী। বিদ্যার পরীক্ষার জন্য রাজপুত্র তিনটি প্রশ্ন করবে। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ কিংবা যে কোনও শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করা হতে পারে। কন্যা যদি তার সঠিক উত্তর দিতে পারে, তখন তাকে তিনটি বুদ্ধির প্রশ্ন করা হবে। সেখানেও যদি কন্যা জয়ী হয়, তাহলে অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা হবে। অস্ত্রশিক্ষায় তিনধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, অসিচালনা, মল্লযুদ্ধ আর তির-ধনুক চালনা। কন্যারা যেটি ইচ্ছে বেছে নিতে পারবে। অস্ত্রশিক্ষাতেও জয়ী হলে রাজপুত্র তার গলায় মালা পরিয়ে তাকে বিবাহ করবে। যেসব কন্যারা পরাজিত হবে তারা কিন্তু আর আগের আসনে ফিরে যেতে পারবে না। তাদের জন্য আছে আলাদা বসার ব্যবস্থা। রাজপুত্র কী প্রশ্ন করছে, সেটা যাতে প্রতিযোগীরা আগে জানতে না পেরে যায় সেইজন্যই এরকম পৃথক বসার আয়োজন।

সবাই আসনে বসে পড়ার পর তুরী-ভেরী বেজে উঠল। সোনালি রঙের রেশমের পোশাক পরে রাজপুত্র সূর্যদেব এসে আসনে বসল। ঘোষক ঘোষণা করলেন প্রথম প্রতিযোগী তিন সমুদ্রের ওপারের দেশ বৈজয়ন্তপুরের রাজকন্যা মুক্তামালা। সকালের শিশিরের মতো স্নিগ্ধ সুন্দরী রাজকন্যা মুক্তামালা উঠে গিয়ে সূর্যদেবের সামনের আসনে বসল। প্রথমে বিদ্যার পরীক্ষা। রাজপুত্র মুক্তামালাকে পরপর তিনটি প্রশ্ন করল। তিনটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিল মুক্তামালা। এরপর বুদ্ধির পরীক্ষা। রাজার অনুচররা একটি গোল পাত্র এনে রাখল রাজকন্যার সামনে। তাতে রয়েছে কালো সর্ষে আর ঠিক একইরকম আকৃতির ছোট ছোট কালো লোহার দানা। রাজপুত্র বলল, মুক্তামালা, আমি এক থেকে দশ গুনব। তার মধ্যে তোমাকে এই পাত্রের সর্ষে আর লোহার বল আলাদা করে বেছে রাখতে হবে। তোমার যদি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য লাগে তাহলে বলতে পারো।

পাত্রের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে রাজকন্যা মুক্তামালা বলল, এ কী করে সম্ভব রাজকুমার! এতগুলো সর্ষেদানা এত দ্রুত আলাদা করা তো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি হার স্বীকার করছি।

আসন থেকে উঠে গেল মুক্তামালা। দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিরণপুরের পদ্মমালা। পদ্মের মতোই সুন্দরী, পদ্মগন্ধা। রাজপুত্রের প্রথম তিনটি প্রশ্নের সেও চটপট উত্তর দিল। কিন্তু বুদ্ধির খেলায় এসে থামতে হল পদ্মমালাকে।

রাজপুত্র সূর্যদেব মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। বুড়ো মন্ত্রী উদ্বিগ্ন মুখে দাড়ি চুমরিয়ে ঘোষককে বললেন পরের রাজকন্যার নাম ডাকতে। একে একে আসতে লাগল রাজকন্যারা। কিন্তু কিছুতেই আর কেউ রাজপুত্রের সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় এঁটে উঠতে পারে না।

একটু একটু করে খালি হয়ে গেল রাজকন্যাদের আসন। তাদের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল অন্যরা। মন্ত্রী, সেনাপতি কিংবা অন্য যেসব গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা এসেছিল রাজপুত্রকে বিয়ে করার আশায়, তাদের অনেকেই চুপিচুপি আসন ছেড়ে চলে গেল। পরিস্থিতি দেখে রাজা বজ্রদেবের ভুরুর ভাঁজ তখন ক্রমশ গভীর হচ্ছে।

রাজকন্যারা যেখানে বসে ছিল, তার একপাশে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে। দীঘল চেহারা। গায়ের রঙ যেন বর্ষার ঘনিয়ে আসা মেঘ। কচি কলাপাতা রঙের শাড়িটি আঁট করে পরা। মাথায় গোঁজা পলাশের মালা। রাজকন্যাদের আসন যখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে আর রাজপুত্রের মুখের হাসি চওড়া হচ্ছে, তখন সে গিয়ে ঘোষককে বলল, আমার নামটা লিখে নাও দেখি...

তুমি রাজপুত্রের প্রশ্নের জবাব দেবে? ঘোষক যেন একটু অবাক। রাজা বজ্রদেব দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই। তিনি কিন্তু তক্ষুনি এগিয়ে এসে বললেন, নিশ্চয়ই দেবে। আমি তো বলেইছি, যে কোনও মেয়ে চাইলেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। তোমার নামটি কী বলো, এখনই লিখে নেওয়া হবে।

আমার নাম গুঞ্জা, আমি ব্যাধের মেয়ে, কাঞ্চনপুরের প্রান্তে জঙ্গলে আমার বাড়ি।

লিখে নিলেন ঘোষক। একটু পরেই ডাক পড়ল গুঞ্জার। তাকে দেখে মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসল রাজপুত্র। মনে মনে ভাবল, ব্যাধের মেয়ে হয়ে এর সাধ হয়েছে রাজরানি হওয়ার! প্রথম প্রশ্নেই তো সব সাধ কর্পূরের মতো উপে যাবে। মুখে অবশ্য কিছু বলল না। গুঞ্জা নিজের আসনে বসলে, রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল, বলো তো কন্যে রাজমাতা গান্ধারীর কটি সন্তান ছিল?

১০১টি। একশোটি পুত্র আর একটি কন্যা। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল গুঞ্জা। সূর্যদেব এবার একটু ভেবে নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, মহাভারতের কোন রাজকন্যা পুরুষের পোশাক পরে যুদ্ধযাত্রা করতেন?

এর উত্তর তো ভারী সহজ রাজপুত্র, মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।

আচ্ছা, সীতাকে যখন রাবণ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন পথের সংকেত দেওয়ার জন্য তিনি নিজের গায়ের গয়না খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সেকথা নিশ্চয় জানো?

রাজপুত্রের প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নাড়ল গুঞ্জা।

আচ্ছা বলো দেখি এরমধ্যে কোন গয়নাগুলি

লক্ষ্মণ চিনতে পেরেছিলেন?

শুধুমাত্র নূপুর। লক্ষ্মণ যেহেতু সবসময় শুধু সীতার পায়ের দিকে তাকাতেন, তাই তিনি শুধু নূপুরটিই চিনতে পেরেছিলেন।

প্রশ্নের উত্তর সঠিক। রামায়ণ-মহাভারত পড়েছে ঠিকই কিন্তু বুদ্ধির খেলায় একে সহজেই হারিয়ে দেওয়া যাবে। মনে মনে আবার ভাবল রাজপুত্র সূর্যদেব। তার নির্দেশে ভৃত্যরা নিয়ে এল সেই সর্ষে আর লোহার দানা মেশানো পাত্র।

আমি এক থেকে দশ গুনব, তার মধ্যে এই বাটি থেকে সর্ষের দানাগুলি তোমাকে আলাদা করে বেছে দিতে হবে কন্যে। দ্যাখো, পারবে যদি বলো। কোনও সাহায্য লাগলে তাও বলতে পারো।

গুঞ্জা রাজপুত্রের হাত থেকে বাটিটি নিয়ে ভালো করে দেখল। তারপর একটু হেসে কোঁচড় থেকে চৌকোমতো কালো একটি জিনিস বার করে বলল, সাহায্য লাগবে না। তুমি গুনতে শুরু করো রাজপুত্র।

সূর্যদেব একটু অবাক হয়ে গুঞ্জার দিকে তাকিয়ে সবে গুনতে শুরু করেছে অমনি গুঞ্জা সেই চৌকোমতো জিনিসটা ধরল বাটির ওপরে। আর বাটি থেকে অজস্র গোল গোল লোহার দানা বেরিয়ে আটকে গেল তার গায়ে। বাটিটি রাজপুত্রের হাতে দিয়ে গুঞ্জা বলল, এই নাও রাজকুমার। তোমার সর্ষে বাছা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস এই চুম্বকটা সঙ্গে ছিল, নাহলে বুদ্ধির খেলায় আজ তোমার কাছে হারতে হত।

গুঞ্জার বুদ্ধি দেখে ততক্ষণে রাজপুত্রের কপালে হালকা ভাঁজ পড়ছে। রাজা আর মন্ত্রীর চোখ চকচক করছে। রানি মহিশিলা তো উত্তেজনায় নিজের আসনের ওপর পা তুলে বসে পড়েছেন। ব্যাধের মেয়ের সামনে এবার রাজপুত্র দিল অন্য একটি পাত্র। তাতে মেশানো আছে পোস্তদানা আর নুন। এক থেকে দশ গোনার মধ্যে আলাদা করতে হবে দুটোকে। গুঞ্জা একটু মুচকি হাসল। তারপর ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নিল এক পাত্র জল।

গুনতে শুরু করো রাজকুমার, বলেই সে পাত্রের জলটা ঢেলে দিল বাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে জলে গুলে গেল নুন। পড়ে রইল পোস্তদানা। তার বুদ্ধি দেখে হাততালি দিয়ে উঠলেন রানি মহিশিলা। এবার তৃতীয় পরীক্ষা।

রাজপুত্রের নির্দেশে ভৃত্যরা নিয়ে এল এক পাত্র দুধ আর এক পাত্র জল। তারপর সেই দুধ আর জল একসঙ্গে মিশিয়ে পাত্রটি গুঞ্জার দিকে এগিয়ে দিয়ে সূর্যদেব বলল, এবার এই পাত্র থেকে জলটুকু আমাকে আলাদা করে দাও। দশ নয় একশো গুনব। একটু বেশি সময়ই তোমায় দিলাম।

গুঞ্জা খুব মন দিয়ে দেখল বাঁশ তিনটিকে

একটু বেশি সময় তো লাগবেই কুমার। বলেই গুঞ্জা লাফ দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এক দৌড়ে পাশের সরোবরে যে রাজহাঁসগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার মধ্যে একটিকে কোলে করে নিয়ে এল। তারপর তার মুখের সামনে ধরল দুধ-জল মেশানো বাটিটি। অমনি সেই হাঁস চুকচুক করে খেয়ে নিল দুধটুকু। বাটিতে পড়ে রইল শুধু জল।

আর মাত্র একটি পরীক্ষা বাকি।

উল্লাসে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা বজ্রদেব। রাজপুত্রের কিন্তু তখন মুখ গম্ভীর। মন্ত্রীমশাই গুঞ্জাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অস্ত্রবিদ্যায় তুমি কোনটিতে পারদর্শী কন্যা?

আমি তিনটিতেই পারদর্শী মন্ত্রীমশাই। কুমার যেটি চায় সেটিরই পরীক্ষা নিতে পারে।

গুঞ্জার কথা শুনে একটু ভেবে সূর্যদেব বলল, বেশ তবে ধনুর্বিদ্যারই পরীক্ষা হোক। এখান থেকে তিনশো হাত দূরে পোঁতা আছে তিনটি বাঁশ। তার মাথায় লাগানো আছে লাল রঙের তিনটি সরু লম্বা কাগজের ফালি। তির ছুঁড়ে সেই তিনটি ফালিকে বিঁধতে হবে একসঙ্গে।

রাজপুত্রের কথা শুনে গুঞ্জা খুব মন দিয়ে দেখল বাঁশ তিনটিকে। বাঁশগুলি সমান মাপের নয়, উঁচুনিচু। বসন্তের এলোমেলো বাতাসে কাগজের ফালিগুলি উড়ছে। ধনুকে তির জোড়ার আগে, সে মাটি থেকে একমুঠি ধুলো তুলে নিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেখে নিল বাতাস কোনদিকে বইছে। তারপর ধনুকে তির পরিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে তির ছেড়ে দিল। রাজপুত্র সূর্যদেব স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তিরটি অনেকটা সাপের মতো তিনটি কাগজের ফালিকে বিদ্ধ করে আটকে গেল বাঁশের গায়ে। হেরে যাওয়া রাজকন্যারা হাততালি দিয়ে উঠল। অভিনন্দন জানালেন রাজা বজ্রদেব। রানি মহিশিলা জড়িয়ে ধরলেন গুঞ্জাকে। গুঞ্জা কিন্তু শান্তস্বরে বলল, কুমার, আমি তো অনেকগুলি পরীক্ষা দিলাম। তুমি কি আমার কাছে একটি পরীক্ষা দিতে রাজি আছ? একটু অবাক হলেও রাজি হল সূর্যদেব।

বেশ, তোমাকেও তাহলে একইভাবে তিনটি কাগজের ফালিকে বিঁধতে হবে একটি তিরে। তবে সেদিকে তাকাতে পারবে না। তোমাকে তির ছুঁড়তে হবে পিছন ফিরে।

কঠিন পরীক্ষা। ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে পড়ল রাজকুমার। কিন্তু পিছিয়ে আসা তো যায় না। রাজা, রানি, মন্ত্রী তো আছেনই, পরাজিত রাজকন্যারাও তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাই গুঞ্জার কথামতো তির ছুঁড়ল রাজকুমার। কিন্তু লক্ষ্যবিদ্ধ হল না। তির গিয়ে লাগল বাঁশের গায়ে। অপ্রস্তুত হল সূর্যদেব। তার হাত থেকে তির-ধনুক নিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে গুঞ্জা অনায়াসে তিনটি কাগজের ফালি বিদ্ধ করে বলল, জঙ্গলে কতদিন আন্দাজে তির ছুঁড়ে ফল পেড়েছি কুমার। ধনুর্বিদ্যায় চোখের আন্দাজই সবথেকে বড় ব্যাপার।

গুঞ্জার কথা শেষ হওয়ার আগেই হৈহৈ করে ছুটে এলেন রানি মহিশিলা। হাতে তাঁর বরণের থালা। ছুটে এল রানির সখীরা। কারুর হাতে ফুল, কারুর হাতে যুঁই, জাতী, যূথী কিংবা অন্য কোনও ফুলের মালা। কেউ শাঁখ বাজাতে লাগল, কেউ উলু দিতে লাগল। সবাই যখন তাকে ঘিরে ধরেছে তখন এতসব হৈচৈ-এর মাঝখানে গুঞ্জা কোনওরকমে সবাইকে থামিয়ে বেশ একটু অপ্রস্তুতভাবেই রানিকে বলল, আমি কিন্তু রাজপুত্রকে বিয়ে করব বলে আসিনি রানিমা। হাটে এসেছিলাম। সওদা নিয়ে ফেরার পথে যখন শুনলাম নানা দেশের রাজকন্যেরা সব এসেছে, তখন কোন কন্যেটি আমাদের রাজকুমারকে জিতে নেয় দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তারপর দেখি রাজকন্যেরা সব হেরে যাচ্ছে আর রাজ-পুত্তুরের মুখটি একেবারে গর্বে-আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। তখন মনে হল, আমি নাহয় দেখি একবার, কত কঠিন প্রশ্ন করছেন কুমার। তাই মাথার ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে চলে এলাম।

রানি মহিশিলা হেসে ফেলে বললেন, সে যাই-ই হোক না কেন। এখন তো তুমি জিতে গেছ। এখন তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে রাজপুত্রের। গুঞ্জা এবার একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, তা কী করে হবে রানিমা! আমি হলাম গিয়ে ব্যাধের দলের সর্দারের মেয়ে। বাবা মরলে, দলের দেখাশোনা সব আমাকেই করতে হবে। আমি রানি হয়ে এখানে বসে থাকলে তাদের দেখবে কে? আর তাছাড়া আমি তো সেই কোন ছোটবেলাতেই ঠিক করে ফেলেছি আমার রাখাল বন্ধুকে বিয়ে করব। সেকথাই বা ভাঙি কী করে?

গুঞ্জার কথা শুনে রাজা-রানির তো মাথায় হাত। এত কষ্টে যদি বা একজন কন্যে পাওয়া গেল, সেও তো আবার রাজকুমারকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাঁদের অবস্থা দেখে গুঞ্জাই আবার তড়িঘড়ি বলল, মহারাজ, আপনারা এত চিন্তা করছেন কেন? রাজকন্যারা সবাই ভারী বিদ্বান আর বুদ্ধিমান। আমি তো পাঠশালে পড়ে আর ঠাকমা-দিদিমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। বেশি পুঁথি পড়িনি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওরা তো আমার মতো সারাদিন হাটে-মাঠে ঘুরে কাজকর্ম করে বেড়ায় না। তাই রাজপুত্রের সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় হেরে গেছে। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে যাকে আপনাদের সকলের ভালো লাগছে, তার সঙ্গেই রাজপুত্রের বিয়ে দিন। সেই হবে আমাদের কাঞ্চনপুরের যোগ্য রানি।

গুঞ্জার কথা শুনে এবার হেসে ফেললেন রাজা বজ্রদেব। তারপর বললেন, বেশ ঠিক আছে। তুমি যা চাইছ তাই হবে। কিন্তু তোমাকেও আমাদের একটি কথা দিতে হবে।

কী কথা বলুন?

তোমাকে বন্ধু হয়ে সারাজীবন রাজপুত্রের পাশে থাকতে হবে। তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

নিশ্চয়ই থাকব মহারাজ। আমি আর আমার রাখাল বন্ধু দুজনেই থাকব রাজকুমারের পাশে পাশে। কিন্তু এখন আমাকে বিদায় দিন মহারাজ। অনেকটা পথ যাব, বেলা গড়িয়ে যাবে।

মাথায় ঝুড়ি নিয়ে গুঞ্জা আর তার রাখাল বন্ধু মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে। রাজামশাই বললেন, চলো রানি, এবার তাহলে বিয়ের আয়োজন করি গিয়ে। তোমার তো ওই দারুচিনি দ্বীপের বিদুষী রাজকন্যাটিকে ভারী ভালো লেগেছিল। তার সঙ্গেই ব্যবস্থা করি। মন্ত্রীমশাই, বিয়ের আগে আমি নিজে গিয়ে জঙ্গলের ওই ব্যাধের গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ করে আসব। রানি, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু।

আমিও যাব গুঞ্জাকে নেমন্তন্ন করতে। আর আমার অভিষেকের সময়ও গুঞ্জা আমার পাশে থাকবে। তুমি দেখে নিও বাবা, ওই হবে আমার সবথেকে ভালো বন্ধু।

রাজপুত্রের কথা শুনে চোখে চোখে তাকালেন রাজা আর রানি। দুজনেরই ঠোঁটে খেলে গেল খুশির হাসি।

ফিচার

রূপকথা ও ফ্যান্টাসির আশ্চর্য দুনিয়া

সৌভিক চক্রবর্তী

অনেক বছর আগের কথা। ক্যানসাসের এক খামারে পিসি, পিসেমশাই আর পোষা কুকুর টোটোর সঙ্গে থাকত বাচ্চা মেয়ে ডরোথি। দিব্যি আনন্দে দিন কাটছিল, এমন-সময় ঘটল অঘটন।

এক ভয়ংকর সাইক্লোন এসে খামারবাড়িসুদ্ধু ডরোথি আর টোটোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল বহুদূরে, জাদুরাজ্য অজ-এর মাঞ্চকিন নগরে। সেখানে পৌঁছে ডরোথি দেখল, ওদের খামারবাড়ির নীচে চাপা পড়েছে মাঞ্চকিন নগরের অত্যাচারী রানি দক্ষিণের দুষ্টু ডাইনি। পরাধীন মাঞ্চকিনদের মুক্ত করার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ডরোথিকে জাদু জুতো উপহার দিলেন উত্তরের ভালো জাদুকরী, বললেন এমারাল্ড শহরে গিয়ে মহান জাদুকর উইজার্ড অফ অজ-এর খোঁজ করতে, কারণ একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন ওর বাড়ি ফেরার রাস্তা। অচেনা, অজানা দেশে এমন একটা অভিযান মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু তাতে একটুও ঘাবড়াল না ডরোথি, টোটোকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল এমারাল্ড শহরের দিকে। যাওয়ার সময় ভালো জাদুকরী ওর কপালে চুমু দিয়ে এঁকে দিলেন শুভ চিহ্ন, যা সবরকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে ওকে। পথে ডরোথির বন্ধুত্ব হল কাকতাড়ুয়া, টিনের তৈরি কাঠুরে আর ভীতু সিংহের সঙ্গে। তারপর...

কেমন লাগল বন্ধুরা, ডরোথির গল্পের ছোট্ট এই ঝলক? তারপর কী হল, জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই? অজ-এর জাদুকরকে কীভাবে খুঁজে পেল ডরোথি, ক্যানসাসে পিসি-পিসেমশাইয়ের কাছে ফিরে যেতে পারল কিনা, কাকতাড়ুয়া, টিনের কাঠুরে আর ভীতু সিংহেরই বা কী হল—মনের মধ্যে উঁকি দেওয়া সব প্রশ্নের উত্তর তোমরা পাবে এল. ফ্র্যাঙ্ক বাউমের 'দ্য ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অফ অজ' বইয়ের পাতায়। ১৯০০ সালের মে মাসে যখন প্রথমবারের জন্য দিনের আলো দেখেছিল 'অজ'-এর রূপকথা, লেখক বোধহয় ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি এতটা খ্যাতি পাবে তাঁর উপন্যাস। কিন্তু তাই হয়েছে। স্টেজ প্লে, সিনেমা, মিউজিক্যাল শো—সব মঞ্চেই আশাতীত সাফল্য পেয়েছে বাউমের কাহিনি, হয়ে উঠেছে 'America's greatest and best-loved fairy tale'। এবং তোমরা জানলে খুশি হবে, 'উইজার্ড অফ অজ' লিখেই ক্ষান্ত দেননি বাউম, খুদে পাঠকদের দাবি মেনে 'অজ'-এর ম্যাজিক রাজ্যকে নিয়ে লিখেছিলেন আরও তেরোটি সিকুয়েল উপন্যাস। প্রায় এক শতক হতে চলল তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর 'অজ' সিরিজ আজও আমেরিকান রূপকথার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রূপকথা—ভীষণ মায়াবী একটা শব্দ, যা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবের আলো ঝলমলে দিনগুলোতে, ঘুমপাড়ানি গানের দেশে। মনে পড়িয়ে দেয়, কী অনায়াসে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে সীমানা পেরিয়ে যেত বীর রাজকুমার, সোনার কাঠি রুপোর কাঠি বুলিয়ে ঘুম ভাঙাত বন্দি রাজকন্যার! আদিগন্ত বিস্তৃত ক্ষীরসাগর, হিরে-মুক্তোর দ্বীপ, কথা বলা হীরামন পাখি, ভ্রমরের দেহে প্রাণ লুকিয়ে রাখা রাক্ষস—স্মৃতির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলে একের পর এক রঙিন জলছবি! কালের নিয়মে আমাদের বয়স বেড়েছে, ব্যস্ততা বেড়েছে, হাতের মুঠো থেকে পিছলে গিয়েছে সময়। তবু রূপকথার প্রতি আকর্ষণ কমেনি। 'পিনোচ্চিও', 'স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ফস', 'দ্য হ্যাপি প্রিন্স' আজও সেই দুর্লভ পরশপাথর যার ছোঁয়ায় সোনারঙ নেয় আমাদের জীবনের অতি সাধারণ মুহূর্তগুলো; 'লালকমল নীলকমল', 'সাত ভাই চম্পা এক বোন পারুল', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' আজও বয়ে আনে এক অদ্ভুত 'সেন্স অফ ওয়ান্ডার' যা আমাদের মনের বয়স বাড়তে দেয় না। রূপকথারা আছে বলেই আমরা এখনও স্বপ্ন দেখি, পিটার প্যানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠি—'I do believe in fairies! I do! I do!'

পৃথিবীর সর্বপ্রথম রূপকথার সৃষ্টি কবে এবং কোথায় সে নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও একটা বিষয়ে তাঁরা একমত, আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে, সতেরোশো শতকের আশেপাশে লিখিত রূপকথার জন্ম। আঠেরোশো শতক থেকে নতুন করে সংকলিত হতে থাকে 'দ্য স্মিথ অ্যান্ড দ্য ডেভিল', 'জ্যাক অ্যান্ড দ্য বীন স্টক' জাতীয় বহু পুরোনো গল্প। ঊনবিংশ শতাব্দী বিশ্ব রূপকথার স্বর্ণযুগ ঃ ১৮১২ সালে জার্মানিতে প্রকাশিত জেকব ও উইলহেম গ্রিম-এর 'চিলড্রেন'স অ্যান্ড হাউজহোল্ড টেলস' (যা পরবর্তীকালে ইংরেজিতে 'গ্রিম'স ফেয়ারি টেলস' নামে জনপ্রিয় হয়),

ছবি ঃ অঞ্জন দত্ত

বাপ', 'জোলা', 'টুনটুনির গল্প', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', সুকুমার রায়ের 'হযবরল' আমাদের অতিপরিচিত। আর চেনা শৈলেন ঘোষের গল্প; উনিশশো আশি এবং নববইয়ের দশকে জন্মানো এমন কোনও খুদে নেই যে 'মিতুল নামের পুতুলটি', 'জাদুর দেশে জগন্নাথ', 'আলোর আকাশে ঈগল', 'খুদে নায়কের নামটি রুং', 'সোনাঝরা গল্পের ইনকা' পড়ে মুগ্ধ হয়নি। এবং আমাদের সৌভাগ্য, সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে। অনন্যা দাশ, দীপান্বিতা রায়, রতনতনু ঘাটীদের কলমে ভর রেখে তরতরিয়ে এগোচ্ছে বাংলা রূপকথা।

১৮৫৫ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে রাশিয়ায় কয়েক কিস্তিতে ছেপে বেরোনো আলেকজান্ডার আফানাসিয়েভ-এর 'রাশিয়ান ফেয়ারি টেলস' এবং ১৮৯০ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশ পাওয়া জোসেফ জেকবস-এর 'ইংলিশ ফেয়ারি টেলস' এই সাহিত্যধারার সংজ্ঞাই শুধু পালটায়নি, বুনিয়াদও মজবুত করেছে। আর যাঁর কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে তিনি বিখ্যাত ড্যানিশ সাহিত্যিক হ্যান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসেন। ছোটদের জন্য লিখতে ভালোবাসতেন হ্যান্স, স্ক্যান্ডেনেভিয় প্রেক্ষাপটে প্রচলিত কিছু গল্পের মোটিফ নিজের মতো করে ব্যবহার করে রচনা করেছেন অনবদ্য সব রূপকথা। তাঁর 'থাম্বেলিনা', 'দ্য আগলি ডাকলিং', 'দ্য নাইটিংগেল', 'দ্য লিটল মারমেড', 'দ্য স্নো কুইন'-এর কাছে আমাদের শৈশবের ঋণ অনস্বীকার্য।

বাংলা সাহিত্যে রূপকথার উজ্জ্বল অতীত নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। লিউইস ক্যারল-এর 'অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' বা রোয়াল্ড ডাল-এর 'চার্লি অ্যান্ড দ্য চকোলেট ফ্যাক্টরি' পড়ার অনেক আগেই রূপকথায় হাতেখড়ি হয়ে যায় বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়েদের, মা-দিদিমাদের মুখে বুদ্ধুভুতুম, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ডালিমকুমারের গল্প শুনে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাপ্য 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি', 'দাদামশাইয়ের থলে'র মতো অনবদ্য সংকলনের জনক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের। বাংলার অন্যান্য রূপকথার মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'বুদ্ধুর

রূপকথায় আঞ্চলিক প্রভাব স্পষ্ট। গ্রিম ভাইদের গল্পগুলো চরিত্রগত দিক দিয়ে পুরোপুরি ইউরোপীয়, আবার দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' স্বাদে-গন্ধে আদ্যোপান্ত বাঙালি। এই কারণে অনেকেই রূপকথা এবং উপকথাকে এক করে দেখেন। আদপে কিন্তু তা নয়, উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দুটো ভিন্ন। রূপকথা মূলত ইচ্ছেপূরণের গল্প, বাস্তবের রুক্ষতা থেকে সাময়িক মুক্তি দিয়ে পাঠককে কল্পনার উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়াই এর প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে উপকথা কোনও এক নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচলিত কাহিনি, যা সেখানকার লোকাচার, সমাজজীবন বা ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। রূপকথা একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা, কোনও না কোনও লেখক বা সংকলকের সৃষ্টিকর্ম। কিন্তু উপকথা লোকমুখে প্রচারিত হওয়ায় তার আদি স্রষ্টা বা গল্পকারের খোঁজ পাওয়া রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। রূপকথার গল্পগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই থাকে, সেরকম কোনও পরিবর্তন বা প্রক্ষেপণ তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রচলিত উপকথার ক্ষেত্রে একই গল্পের একাধিক সংস্করণ পাওয়া যায়, যেখানে গল্পের মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত অথচ স্থান, কাল, চরিত্র এবং ঘটনাপরম্পরা অনেকটাই আলাদা। তবে একটা বিষয়ে দুটোর মধ্যে মিল আছে, আর তা হল আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে পপুলার ফিকশনে জায়গা বানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। রূপকথার ইউনিকর্ন, পক্ষীরাজ, জলপরী, ডোয়ার্ফদের পাশাপাশি চিনদেশীয় উপকথার উড়ন্ত সরীসৃপ ড্রাগন, মধ্য ইউরোপের কিংবদন্তীর নেকড়ে-মানুষ ওয়্যারউল্ফ, আইরিশ লোকগাথার মহাশক্তিশালী জাদুকর ড্রুইড, নর্থ আমেরিকার জঙ্গলের নরখাদক ওয়েন্ডিগো, স্কটল্যান্ডের জলদানব লক নেস মনসটাররাও তাদের স্থান করে নিয়েছে বিশ্বসাহিত্যের মানচিত্রে, আন্তর্জাতিক সিনেমার দরবারে।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। হ্যারি পটারকে তোমরা সবাই চেনো; হয় বইয়ের পাতায়, নয়তো রুপোলি পর্দায় আলাপ হয়েছে ওর সঙ্গে। কপালে বিদ্যুৎচিহ্নের মতো কাটা দাগ আর উজ্জ্বল সবুজ চোখের চশমা পরা হ্যারিকে আমরা প্রথম পাই ১৯৯৭ সালে, ব্রিটিশ সাহিত্যিক জে. কে. রাউলিং-এর 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোজফার্স স্টোন' উপন্যাসে। শিশুবেলায় অশুভ জাদুকর লর্ড ভলডেমর্টের হাতে বাবা জেমস আর মা লিলির মৃত্যু হলেও মারণশাপ 'আভাডা কেডাভ্রা'র হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিল ও, গোটা জাদুসমাজের কাছে হয়ে উঠেছিল আশার প্রতীক, 'দ্য বয় হু লিভড'। তারপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর, মাগল (ম্যাজিক না জানা) মাসি-মেসোর অনাদর আর মাসতুতো ভাইয়ের নির্যাতন সহ্য করে বড় হয়ে উঠতে থাকে অনাথ হ্যারি। ডার্সলিদের সঙ্গে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে ও, এমন সময় পালটে যায় সবকিছু। এগারোতম জন্মদিনের

সকালে হ্যারি জানতে পারে ও একজন উইজার্ড, 'হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজার্ডরি' থেকে ডাক এসেছে ওর। প্রাইভেট ড্রাইভের নিঃসঙ্গতাকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে পড়ে হ্যারি, মুক্তি আনন্দে, জাদু-জগতের সন্ধানে। ভাবতে অবাক লাগে, 'ফিলোজফার্স স্টোন' প্রকাশের প্রায় একুশ বছর পরেও এতটুকু ফিকে হয়নি হ্যারি পটারের আবেদন। রাউলিং-এর অমর সৃষ্টি আজও কনটেম্পোরারি ফ্যান্টাসির এক 'ফেনোমেনন'।

বিশ্বসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যান্টাসি, আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকও। রূপকথা ফ্যান্টাসিরই অংশ, রূপকথাকে বুঝতে গেলে ফ্যান্টাসি সম্বন্ধে জানাটা তাই আবশ্যিক। বর্ণাঢ্য এই ঘরানার শাখা-প্রশাখা অগুনতি, যাদের মধ্যে হাই ফ্যান্টাসি, সোর্ড অ্যান্ড সর্সারি, আর্বান ফ্যান্টাসি, মিথিক ফ্যান্টাসি, সায়েন্স ফ্যান্টাসি, ডার্ক ফ্যান্টাসি এবং ম্যাজিক রিয়েলিজম সাহিত্যানুরাগীদের কাছে বিশেষ সমাদর পেয়েছে। ইতিহাস অনুযায়ী খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত সুমেরীয় 'এপিক অফ গিলগামেশ' দিয়ে ফ্যান্টাসির পথ চলা শুরু। তারপর এসেছে গ্রীক মহাকবি হোমার-এর 'ওডিসি', ভার্জিল-এর রোমান মহাকাব্য 'এনিড', মধ্য- প্রাচ্যের 'আ থাউজ্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস' ('আরব্য রজনী'), ওল্ড ইংলিশে লেখা 'বেউল্ফ' সমৃদ্ধ করেছে এই ঘরানাকে। মূলধারার সাহিত্যও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি; দান্তের 'ডিভাইন কমেডি', শেক্সপীয়ার-এর 'মিডসামার নাইট'স ড্রিম' এবং 'দ্য টেম্পেস্ট', কোলরিজ-এর 'কুবলা খান', টেনিসন-এর 'দ্য লেডি অফ শ্যালট', অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'দ্য পিকচার অফ ডরিয়ান গ্রে'-র মতো ফ্যান্টাসি আশ্রিত ক্লাসিকস পাঠকদের মনের মণিকোঠায় চির অমলিন হয়ে রয়েছে।

পাশ্চাত্য ফ্যান্টাসির বিস্তৃত রাজপথে মাইলফলকের অভাব নেই। উনিশ শতকের শেষদিকে রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর 'দ্য জাঙ্গল বুক', বিশ শতকের শুরুতে জেমস ম্যাথিউ ব্যারির 'পিটার অ্যান্ড ওয়েন্ডি' জুভেনাইল ফ্যান্টাসির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তারপর ১৯৫৪-৫৫য় আসে জে. আর. আর. টোলকিন-এর 'লর্ড অফ দ্য রিংস' ট্রিলজি, হাই ফ্যান্টাসিকে পৌঁছে দেয় সাবালকত্বের দোরগোড়ায়। টেরি ব্রুকস-এর 'শানারা' ট্রিলজি, সি. এস. লিউইস-এর 'ক্রনিকলস অফ নার্নিয়া' সিরিজ, ফিলিপ পুলম্যান-এর 'হিজ ডার্ক মেটেরিয়ালস' ট্রিলজি, টেরি প্র্যাচেট-এর 'ডিস্কওয়ার্ল্ড' সিরিজ, ক্রিস্টোফার পাওলিনি-র 'ইনহেরিটেন্স সাইকেল' সেই জয়যাত্রাকেই অব্যাহত রেখেছে; স্টিফেন কিং-এর 'ডার্ক টাওয়ার' সিরিজ, নীল গেইম্যান-এর 'কোরালাইন', 'দ্য গ্রেভইয়ার্ড বুক', 'দ্য ওশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য লেন' নিজের নিজের মতো করে ইতিহাস গড়েছে। পিছিয়ে থাকেননি হাল আমলের সাহিত্যিকরাও; 'সেপ্টিমাস হিপ' সিরিজ লিখে অল্পবয়সী পাঠকদের মন জিতে নিয়েছেন অ্যাঞ্জি সেজ, ইয়ং অ্যাডল্ট ফ্যান্টাসির মুকুটে নিত্যনতুন পালক জুড়ে চলেছেন ক্যাসানড্রা ক্লেয়ার, রিক রায়ার্ডন, ভেরোনিকা রথ।

'কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল পঁচিশি', 'চন্দ্রকান্তা'র দেশ ভারতবর্ষে গত দু'দশকে ফ্যান্টাসি সাহিত্যে এসেছে বিপ্লব—সমিত বসুর 'সোর্ড অ্যান্ড সর্সারি' ঘরানার ফ্যান্টাসি ট্রিলজি 'গেমওয়ার্ল্ড', আমিশ ত্রিপাঠীর মিথিক ফ্যান্টাসি সিরিজ 'মেলুহা', শোভা নিহালনির হিস্টোরিক্যাল ফ্যান্টাসি ট্রিলজি 'নাইন', সঙ্গীতা বাহাদুরের হাই ফ্যান্টাসি সিরিজ 'জাল', মৈনাক ধরের আর্বান ফ্যান্টাসি সিরিজ 'অ্যালিস ইন ডেডল্যান্ড' প্রভৃতির বিপুল জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। বাংলা ফ্যান্টাসির উত্তরাধিকারও কম চমকপ্রদ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আঙুলা' আমাদের সম্পদ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', লীলা মজুমদারের 'হলদে পাখির পালক'-এর মতো মন ভালো করা ইউটোপিয়ান ফ্যান্টাসি যে কোনো সাহিত্যেই বিরল। সুকুমার রায়ের 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'-তে লুকোনো সায়েন্স ফ্যান্টাসির বীজ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা এবং অদ্রীশ বর্ধনের সুপারম্যান বিক্রমজিতের গল্পে মহীরুহের আকার নিয়েছে, সত্যজিৎ রায়ের 'অসমঞ্জবাবুর কুকুর', 'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট' জাতীয় গল্পে এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'অদ্ভুতুড়ে' সিরিজে আর্বান ফ্যান্টাসির হাতছানি পাঠককে কাছে টেনেছে। 'বাঘার আশ্চর্য ডায়েরি'-তে 'ফিল গুড ফ্যান্টাসি'র নকশিকাঁথা বুনেছেন ঋতা বসু, কল্পনার ক্যানভাসে ভারতীয় পুরাণ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুষঙ্গ এবং অ্যাডভেঞ্চারের রঙ ছিটিয়ে বিবেক কুণ্ডু এঁকেছেন বুমবুমের আশ্চর্য অভিযান।

ড্রাগন, পক্ষীরাজ, পরীর মতো কাল্পনিক জীবদের অবাধ আনাগোনা, বাস্তবের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে রূপকের মাধ্যমে পাঠকের কাছে তুলে ধরা, মানবকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দকে গল্পের মোড়কে পরিবেশন করা জাতীয় অনেক বিষয়ই আছে যা রূপকথা এবং ফ্যান্টাসি দু'ধরনের সাহিত্যকর্মেই পাওয়া যায়। তাই হয়তো দু'য়ের মধ্যেকার বিভেদরেখা এতটা ঝাপসা। দশ বছরের অ্যালিস লিডেলকে শোনানোর জন্য যে গল্পগুলো বানিয়েছিলেন লিউইস ক্যারল সেগুলো আদৌ রূপকথা নাকি জটিল মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অনুষঙ্গের ইঙ্গিতবাহী ফ্যান্টাসি তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অ্যান্ডারসেন-এর 'দ্য

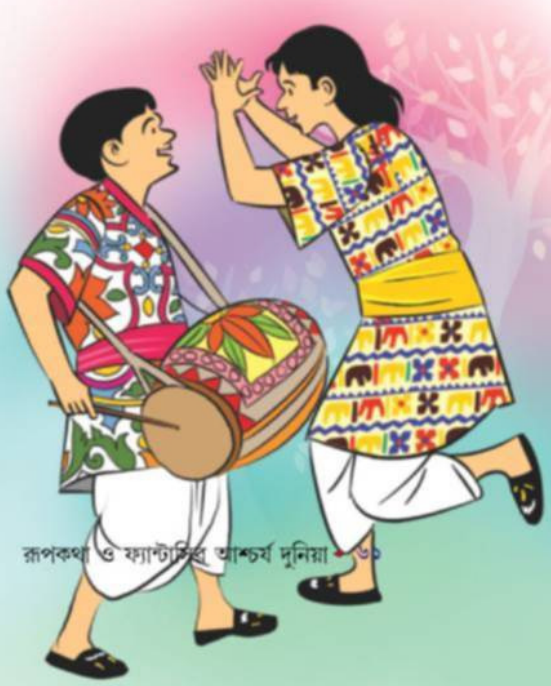

লিটল মারমেড' গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা গাঢ় প্যাথোজ, অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট'-এর বাইবেলীয় অনুষঙ্গ, শিশুপাঠ্য 'হ্যান্সেল অ্যান্ড গ্রেটেল' ও 'লিটল রেড রাইডিং হুড' গল্পের প্রাপ্তমনস্ক বিকল্প বিশ্লেষণ আমাদের অন্যরকমভাবে ভাবতে বাধ্য করে। তবে এগুলো নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম, সামগ্রিকতার নিরিখে, ব্যাপ্তির দিক দিয়ে বিচার করলে ফ্যান্টাসির স্থান চিরকালই রূপকথার ওপরে। রূপকথা জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা একচিলতে আকাশ, ফ্যান্টাসি অনন্ত মহাবিশ্ব; সব রূপকথাই ফ্যান্টাসি, অথচ সব ফ্যান্টাসি রূপকথা নয়।

শিশুতোষ 'হিরো কোয়েস্ট' রূপকথার চরিত্ররা সংখ্যায় অল্প, বেশিরভাগ সময়েই একমাত্রিক, সাদা ও কালোয় বিভক্ত। গল্পের প্লট সরলরৈখিক, ভালো-খারাপের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ, ভাষা তথা ভঙ্গিমায় পরীক্ষা- নিরীক্ষার কোনো সুযোগ নেই। নায়করা সেখানে সবাই সৎ ও নির্ভীক, নায়িকারা আর্ত, নায়কের মুখাপেক্ষী, খলনায়করা—তা সে কুচক্রী রানিই হোক, দুষ্টু ডাইনি অথবা হিংস্র রাক্ষস—খারাপ হওয়ার জন্যই খারাপ। অন্যদিকে 'সিন্ডারেলা' জাতীয় 'র‍্যাগস টু রীচেস' গল্পে দৈব অনুগ্রহে বা জাদুর প্রভাবে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা থেকে রাতারাতি মুক্ত হয় নায়ক বা নায়িকা, পায় নতুন জীবনের আশ্বাস। গল্পগুলোর পরিসমাপ্তি আমাদের খুব চেনা—অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে যমজ সন্তানসহ রাপুঞ্জেলকে জঙ্গলের ভেতর খুঁজে পায় রাজকুমার, ডাইনিবুড়িকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরে আসে হ্যান্সেল ও গ্রেটেল, বিউটি-র চোখের জলের ছোঁয়ায় কদাকার বিস্ট পরিণত হয় সুদর্শন যুবকে এবং জীবনের বাকি দিনগুলো সবাই সুখে-শান্তিতে কাটায়। শুরুতে দুঃখ, কষ্ট, নিষ্ঠুরতা থাকলেও শেষে ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যায় সেসব, পড়ে থাকে শুধু 'হ্যাপি এন্ডিং'-এর মিষ্টি অনুভূতি। বাচ্চাদের কোমল মনের জন্য এইধরনের রূপকথা অত্যন্ত উপযুক্ত, 'অ্যান্ড দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার' ঘরানার গল্প তাদের বুকের বাঁদিকে দাগ কাটে অনায়াসেই।

এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করে ফ্যান্টাসি, যার প্রেক্ষাপট এক কাল্পনিক দুনিয়া, কেন্দ্রীয় চরিত্রদের মধ্যে 'গ্রে শেডস' প্রচুর, পার্শ্বচরিত্রদের আচরণ জটিল এবং অনেক- ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী, গল্পে একাধিক সাবপ্লট উপস্থিত। ফ্যান্টাসির উদ্দেশ্য শুধু গল্প বলা নয়, পাঠককে এক গভীর জীবনবোধ, এক নতুন দর্শনের সন্ধান দেওয়া। তাই জীবন, মৃত্যু, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগ জাতীয় মোটিভ ঘুরে ফিরে আসতেই থাকে আমাদের প্রিয় কাহিনিগুলোতে, ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় আমাদের উপলব্ধির সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে হাই ফ্যান্টাসির কথা, যেখানে 'মোনোমিথ' নামের এক বিশেষ ন্যারেটিভ শৈলীর প্রয়োগ আমরা দেখি। আখ্যানের এই ধরন অনুযায়ী নায়কের সামনে আসা 'ক্রাইসিস' বা বিপদের সমাধানে তাকে অংশ নিতে হয় এক দুঃসাহসিক অভিযানে, যেখানে সে পাশে পায় এক বা একাধিক সমমনস্ক সঙ্গীকে। আর থাকে একজন পথপ্রদর্শক, যে নিজের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে নায়ককে লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অন্তিম যুদ্ধে জয়লাভ করে নায়ক যখন ফিরে আসে তখন সে আর আগের মতো নেই, একেবারে অন্য মানুষ। আত্মবলিদান এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আত্মিক উন্নতি ঘটে গিয়েছে তার, মানবিক উত্তরণের পথ বেয়ে সে পৌঁছে গিয়েছে চেতনার অন্য স্তরে। এবং এই উত্তরণে সার্থকতা পায় ফ্যান্টাসিও, হয়ে ওঠে রূপকথার থেকে আলাদা, অনন্যসাধারণ।

একুশ শতকে এসে অনেক বদলেছে পৃথিবী, ছোটরাও আর আগের মতো নেই। তাদের কল্পনার নীলাকাশ, বিকেলের খেলার মাঠ, গল্পের বইয়ের ওপর থাবা বসিয়েছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির একাকিত্ব, ডে কেয়ারের বাসের ভিড়, কার্টুন নেটওয়ার্ক আর ভিডিও গেমসের প্রলোভন। তবু এরই মাঝে, মরুভূমির বুকে সদর্পে মাথা তোলা ক্যাকটাসের মতো বেঁচে আছে রূপকথা, ফ্যান্টাসিরা। বাংলার নামী শিশুকিশোর পত্রিকারা এই সাহিত্যধারা দুটোকে নিয়ে আলাদা করে ভাবনা-চিন্তা করছে, কখনও বিশেষ সংখ্যা, কখনও বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা গল্পগুলোকে পাঠকের সামনে মেলে ধরছে। শিশু, কিশোরদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্করাও যথেষ্ট উপভোগ করছেন এই ধরনের গল্প, উৎসাহী হয়ে তুলে দিচ্ছেন তাঁদের বাড়ির ছোটদের হাতে। পার্সি জ্যাকসনের সঙ্গে 'ক্যাম্প হাফ ব্লাড'-এর ঠিকানায় পা বাড়ানোর কথা একবার হলেও ভাবছে আজকের খুদেরা, কখনও বাঘা, কখনও বুমবুমকে সঙ্গী করে ফিরে পেতে চাইছে কল্পজগতের অচিন ঠিকানা।

আর তাই আমরা আশা রাখতেই পারি, সেদিন খুব দূরে নয় যখন তোমাদের সবার হৃদয়ে স্থায়ী বাসা বাঁধবে রূপকথা, চেতন-অবচেতনে ছড়িয়ে যাবে ফ্যান্টাসির মায়া। প্রিয় বন্ধুর মতো তোমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হবে তারা, পাশে বসে কানে কানে বলবে—নেভারল্যান্ড, হগওয়ার্টস, নার্নিয়া'রা বাইরে কোথাও নয়, আছে হৃদয়ের মধ্যিখানেই। শুধু তাদের খুঁজে নেওয়া, হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখার অপেক্ষা।

তোমাদের পাতা

নতুন প্রভাত

ভেদাভেদ যদি ভুলে যাই মোরা
তবে মোরা হব সমান
ধর্মের জিগির তুলব না আর
আনব দেশে নতুন প্রাণ।
মিশব মোরা সবার সাথে
কেউ কারো মোরা নইকো পর,
আমরা সবাই ভারতের ছেলে
ভারত মোদের সবার ঘর।
কিন্তু জাতপাতের বাঁধন
সৃষ্টি করেছে হিংসা-দ্বেষ,
সকলেই বলে আমরাই বড়ো
সেখানে জায়গা পায় না দেশ।
মানুষ যখন পারবে ঘোচাতে
মনের আঁধার, দেশের দুখ
উদিত হবে নতুন সূর্য
মিলবে অপার মিলন সুখ।

সৌভিক মাইতি,
বয়স আঠেরো, দ্বাদশ শ্রেণি,
হেঁড়িয়া শিবপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন,
পূর্ব মেদিনীপুর

মামণি প্রামাণিক, বয়স আঠারো, প্রথম বর্ষ
নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

সাঁঝের বেলা

নীল আকাশের তলায়,
বসে আছি পড়ন্ত বেলায়।
বন্ধু আমার সবুজ গাছ,
আর দূরদিগন্ত মাঠ।
খেলা করছে রং-বেরং-এর পাখি,
ওরাই তো ছিল আমার সাথী।
সরষের হলুদ বাসন্তী ফুল,
আর হয়েছি যে আমি মশগুল।
মাঠের সরু সবুজ নকশার মতোন আল,
তখন সূর্যের আলো হয়ে এসেছে টকটকে লাল।
কৃষক ভাইয়েরা ফিরছে তাদের বাড়ি,
মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে পাখির দল সারি-সারি।
সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ আগে,
শঙ্খধ্বনি উঠেছে ঘরে-ঘরে।

বিশ্বনাথ দত্ত,
বয়স সতেরো, প্রথম বর্ষ,
কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়,
ভদ্রেশ্বর, হুগলি

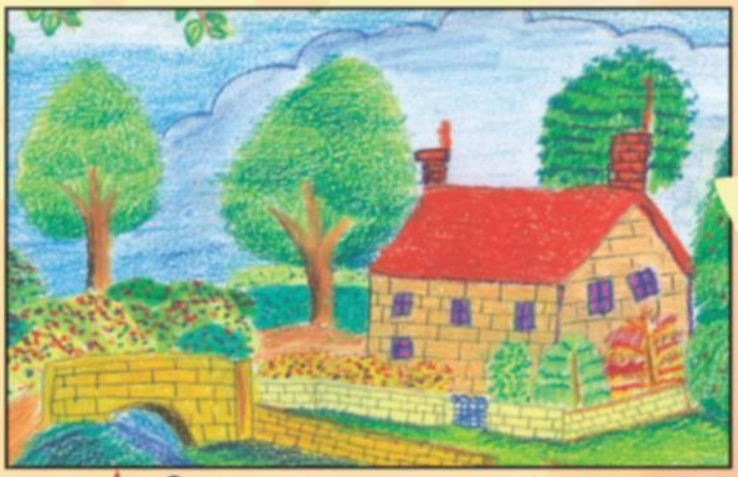

অদ্রিজা মজুমদার, বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণি
আদিত্য আকাদেমি, কলকাতা

তোমাদের পাতা

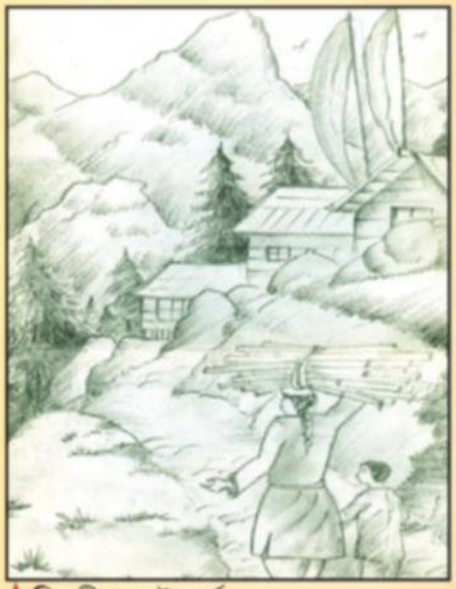

প্রিয়দীপ ভট্টাচার্য, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণি
বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, বর্ধমান

বঙ্গসন্তান

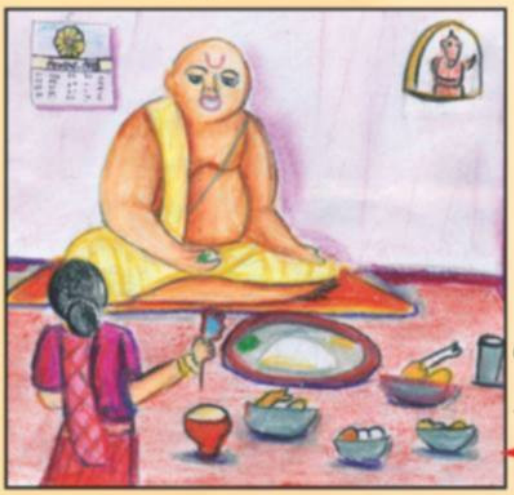

আমাদের কবি, নাম তাঁর রবি,
 কবিতায় এঁকেছেন প্রকৃতির ছবি।
নোবেল পেলেন লিখে গীতাঞ্জলি,
 তাঁহার চরণে দিলেম শ্রদ্ধাঞ্জলি।
বাংলার ছেলে জগদীশ,
 বৃক্ষে পেয়েছেন প্রাণের হদিশ।
আবিষ্কার করেছেন বেতার তরঙ্গ—
 এই আমাদের বিচিত্রভূমি বঙ্গ।
বিপ্লবী পুত্র ক্ষুদিরাম,
 দেশের তরে প্রাণ দিয়ে অমর করেছেন নিজ নাম।
বীর সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ,
 নিয়েছিলেন দেশের মুক্তির প্রয়াস—
বঙ্গসন্তান রামমোহন রায়
 সমাজের কু-সংস্কারকে দিয়েছেন বিদায়।
মারকিউরাস নাইট্রেট অতি বিষম বস্তু হায়!
 আবিষ্কার করলেন আচার্য প্রফুল্ল রায়।
বিদ্রোহী কবি নজরুল,
 কবিতায় ব্রিটিশদের ফুটিয়েছিলেন হুল।
বাংলার ছেলে জীবনানন্দ,
 পেয়েছিলেন আম, কাঁঠাল, হিজলে প্রকৃতির আনন্দ।
এঁরা রেখেছেন ইতিহাসে অবদান,
 এঁরা তো মোদেরই বঙ্গসন্তান।

সৌম্যজিৎ দত্ত,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণি,
শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল,
কলকাতা

রাজন্যা ধর, বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণি
সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল, বিরাটি, কলকাতা

মানুষ

মানুষ হতে গেলে পরে,
প্রকৃতি থেকে শিখতে হবে।
করতে হবে লেখাপড়া,
করবে সবাই খেলাধুলা।
পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ো,
দেশের জন্য কাজ করো।
গরিবের পাশে দাঁড়াও তুমি,
করো শোভন ব্যবহার।
আলবৎ তুমি মানুষ হবে!
সন্দেহ আছে কার?

তথাগত রায়,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণি,
হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন

পৌষালী চন্দ্র, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণি
প্রমীলা কেডিজ স্কুল, বাঙুইআটি, কলকাতা

হাঁদা·ভোঁদার
বাঘ শিকার
জানিস?এই বাঘটা আমার দাদা মেরেছিল!
হিঃ!হিঃ!
হাসালি রে পুঁটে! বন্দুক পেলে আমিও বাঘ মারতে পারি বুঝলি?
সেদিন বিকেলে
হাঁদা! এই নে বন্দুক! পাশের গাঁয়ে নাকি একটা বাঘ এসেছে, দাদাও বাড়ি নেই — এখন তুই ভরসা! চ' ভাই বাঘটাকে মারবি!
এ আর বেশী কি! চ দেখি কোথায় তোর বাঘ?
হাঁদা! তুই এখানে দাঁড়া! আমরা ওদিকে যাচ্ছি।
হাঁদারে! তোর কি সাহস! মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারছিস!
হুঁ-হুঁ-দেখবি!
গার্‌র্‌-র্‌-র্‌!!
ভোঁ-ভোঁদারে! বা-বা—
—বাঘ!
হিঃ-হিঃ-হিঃ!

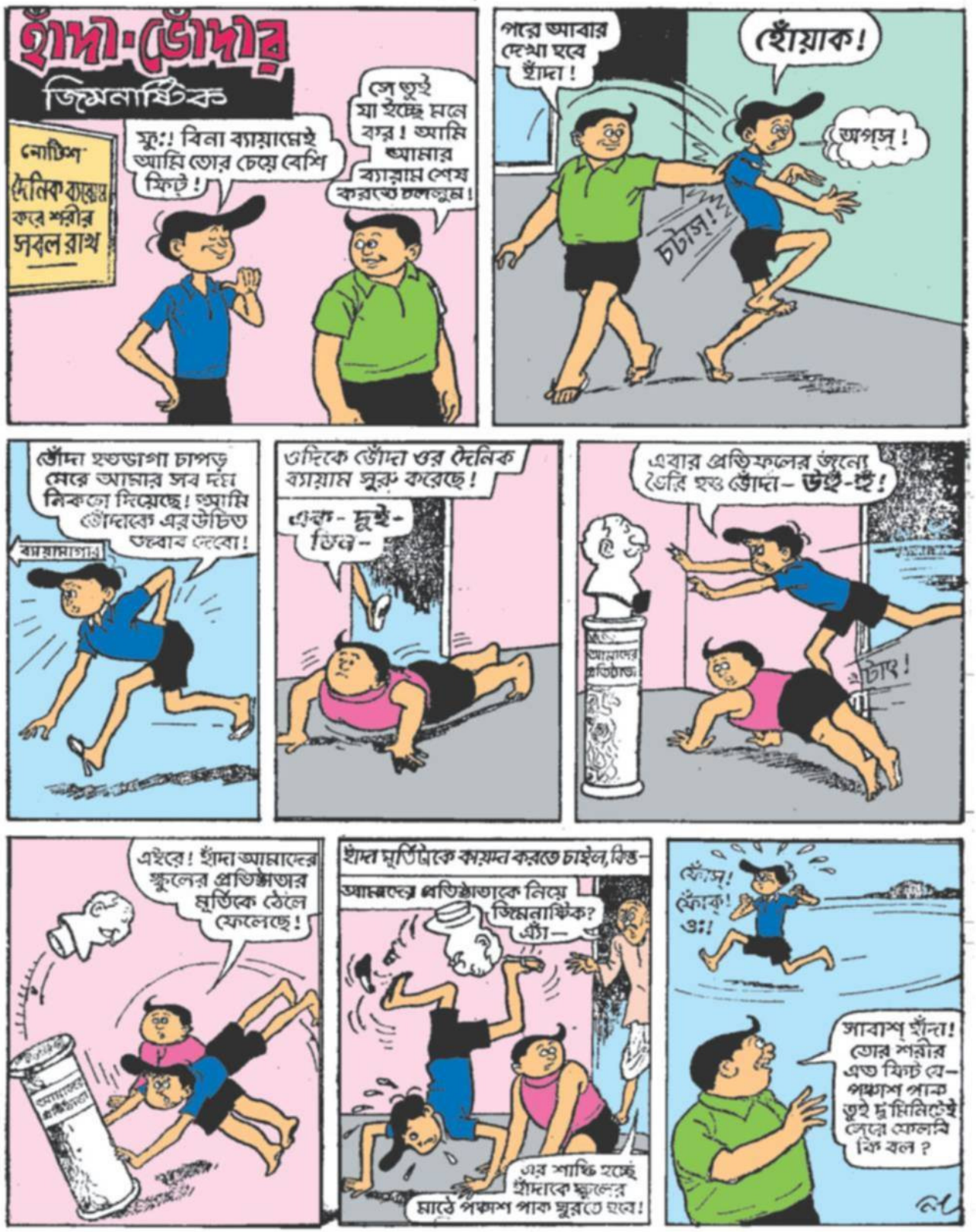
হাঁদা-ভোঁদার
জিমনাস্টিক
নোটিশ
দৈনিক ব্যায়াম করে শরীর সবল রাখ
ফু:! বিনা ব্যায়ামেই আমি তোর চেয়ে বেশি ফিট্!
সে তুই যা ইচ্ছে মনে কর! আমি আমার ব্যায়াম শেষ করতে চললুম!
পরে আবার দেখা হবে হাঁদা!
হোঁয়াক!
অগস্!
চটাস্!
ভোঁদা হতভাগা চাপড় মেরে আমার সব দম নিকলো দিয়েছে! আমি ভোঁদাকে এর উচিত জবাব দেবো!
ব্যায়ামাগার
ওদিকে ভোঁদা ওর দৈনিক ব্যায়াম সুরু করেছে!
এক- দুই- তিন-
এবার প্রতিফলের জন্যে তৈরি হও ভোঁদা- উহুঁ-হুঁ!
আমাদের প্রতিষ্ঠাতা
চাং!
এইরে! হাঁদা আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার মূর্তিকে ঠেলে ফেলেছে!
ব্যায়ামাগার
হাঁদা মূর্তিটিকে কায়দা করতে চাইল, কিন্তু-
আমাদের প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে জিমনাস্টিক? এ্যাঁ-
এর শাস্তি হচ্ছে হাঁদাকে স্কুলের মাঠে পঞ্চাশ পাক ঘুরতে হবে!
ফোঁস্! ফোঁক্! ওঃ!
সাবাশ্ হাঁদা! তোর শরীর এত ফিট যে- পঞ্চাশ পাক তুই দু মিনিটেই সেরে ফেলবি কি বল?